KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ২২/১ ২২/২ ২২/৩	Year of Publication : বৈশাখ- আষাঢ় ১৩৬৭ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৭ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLML

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

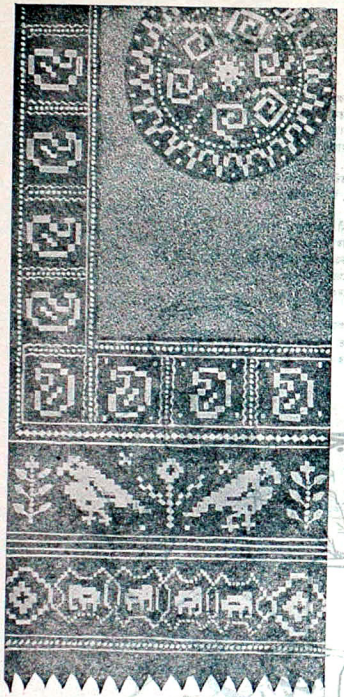

অতীত ঐতিহ্যের বাহক

প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিময় যুগে চারুশিল্পে পরিণত বস্ত্রশিল্প পরবর্তী বিদেশী শাসনে যখন হৃত-গৌরব, তখন স্বাধীনতার দুর্নিবার প্রেরণাই তাকে সেই অতীত-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে আবার অনুপ্রাণিত করে। আত্মনির্ভর স্বদেশে আধুনিকতম বস্ত্রশিল্প আজ সেই ঐতিহ্যেরই বাহক এবং ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনন্য।

পূ র্ব রে ল ও য়ে

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ২০৩
আনন্দ বাগচি ॥ কলকাতার বোধিসত্ত্ব ২১৩
মৃগাঙ্ক রায় ॥ পয়স্বিনী ২১৫
প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ॥ কে যেন ২১৭
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ কৈশোরের প্রতি ২১৮
স্যা-জন্ প্যার্স ॥ ইতিবৃত্ত ২১৯
মনীশ ঘটক ॥ কনখল ২২০
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ ২৩৭
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ কুশাঙ্কুর ২৫২
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ উপন্যাসের কথা ২৬১
কাজী আব্দুল ওদুদ ॥ আধুনিক সাহিত্য ২৭১
সমালোচনা—হরপ্রসাদ মিত্র, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র সান্যাল ২৭৪

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

আগামী বৎসর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সোভিয়েট দেশে যে সমারোহে উদযাপিত হবে, তা সত্যই বিস্ময়কর। বর্তমানেও রবীন্দ্রনাথের রচনার সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিপুল সমাদর। তাঁর যে কোন গ্রন্থের অনুবাদই প্রকাশের অতি অল্পদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। শতবার্ষিকী উপলক্ষে চৌদ্দ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর এক নতুন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনের মূল্যায়ন করে নতুন প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্য আকাদমী আট খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে সংকলন প্রকাশ করছে, তার কবিতা খণ্ডের জন্য আমি যে ভূমিকা লিখেছিলাম, রুষ ভাষায় তার অনুবাদের জন্য মস্কোতে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নিজে আমাকে অনুরোধ করলেন। সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং রুষ ভাষায় যে প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তাতেও তা সন্নিবিষ্ট হবে।

কবি, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী এবং নাট্যকার হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে পরিচিত। শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভারতীয় জীবনে তাঁর যে অপূর্ব দান, এসব ক্ষেত্রেই তাঁর ভাবনা বর্তমান পৃথিবীর জন্য যে কি উপযোগী, সে বিষয়ে বাঙলা দেশের বহুলোকই খবর রাখে না, কাজেই ভারতবর্ষের অন্যত্র অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা এবং বর্তমান যুগের পথিকৃত হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি এখনো ব্যাপক হয়নি। তার কারণও আছে। সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি বা ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার অধিকাংশ আজো ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি, অথবা যেগুলির অনুবাদ হয়েছে, সে অনুবাদ আংশিক এবং বহুক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। তাই শত-বার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত রচনার একটি সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞ প্রায় একশজন বাঙালী মনীষীকে সাহিত্য আলোচনার বাইরে রবীন্দ্রনাথের অন্য গদ্য রচনার মধ্যে তাঁদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিশটি প্রবন্ধ নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হয়। প্রায় চল্লিশজন সাহিত্যরসিক এ আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং তাঁদের নির্বাচনের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ত্রিশটি প্রবন্ধ নতুন করে অনুবাদ করা হয়। সে অনুবাদগুলি দেশে এবং বিদেশে বহু মনীষীর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়

যে তাঁদের দেশের মানুষের কাছে বিশ্ব মানবের আবেদন পৌঁছিয়ে দেবে, এমন পনেরো কুড়িটি প্রবন্ধ যেন তাঁরা তার মধ্য থেকে বেছে দেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনেক মনীষীর সহযোগিতায় অবশেষে আঠারোটি প্রবন্ধ নির্বাচন করে *Towards Universal Man* বা **বিশ্বমানবের সন্ধান** নাম দিয়ে গ্রন্থখানি ভারতবর্ষে, লন্ডনে এবং নিউইয়র্কে ১৯৬১ সালের ৭ই মে প্রকাশিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের মতন সোভিয়েট রাষ্ট্রেও গ্রন্থখানির অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"-কে নাটকে রূপান্তরিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশে তার অভিনয় এখনো হচ্ছে। তাসকন্দে তার বিপুল সমাদর হয়েছে। মস্কোতেও দেখলাম জনসাধারণের হৃদয়কে তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের নতুন অভিনয়ের আয়োজন করছে। পরিষদের অধ্যক্ষ বললেন যে নাটকের চেয়ে নৃত্যনাট্যই সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে বেশী প্রিয়, কিন্তু নৃত্যনাট্যের নির্বাচন নিয়ে তাঁদের মধ্যে খানিকটা মতভেদ ছিল। কারো কারো ইচ্ছা ছিল যে "চণ্ডালিকা"-র অভিনয় হোক কিন্তু আমি তাঁদের বললাম যে "চণ্ডালিকা" একান্তভাবে ভারতবর্ষের জন্য রচিত। ভারতবর্ষের পরিবেশ বাদ দিলে তার স্বাদ অন্য দেশে পুরোপুরি গ্রহণ করা কঠিন, তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার তেমন সার্থকতা নেই। তাছাড়া, ভারতবর্ষের সামাজিক গলদ ভারতবর্ষে দেখানোর যতখানি প্রয়োজন অন্যদেশে সে প্রয়োজন নেই। "তাসের দেশ" হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী উপযোগী, কিন্তু ঠিক যে কারণে "তাসের দেশ" সোভিয়েট রাষ্ট্রে দেখাতে বাধা আসতে পারে, ঠিক সেই কারণেই "চণ্ডালিকা" সেখানে দেখানো অনুচিত।

আমি বললাম যে আমার মতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা" সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আবেদন কোনো দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়। নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যার "চিত্রাঙ্গদা"য় রূপায়ন, সর্বদেশে সর্বকালে তা মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা হয়ে বেঁচে থাকবে। তবে যদি তারা মত বদলান, নৃত্যনাটোর বদলে নাটক অভিনয় করতে রাজী হন, তবে "বিসর্জন", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী" বা "রাজা"-র অভিনয় শতবার্ষিকী উৎসবে খুবই উপযোগী হবে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পথিকৃত শ্রীশম্ভু মিত্র কিছুদিন আগে মস্কো গিয়েছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও দুয়েকজন বোধ হয় তাঁর অভিনয় দেখেছেন। তাঁদের বললাম যে "রক্তকরবী"-র প্রযোজনা করে শম্ভু মিত্র ভারতীয় নাট্য উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। অনেক আলোচনার পরে স্থির হল যে সর্বাদক বিবেচনা করে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয়ই যুক্তিযুক্ত হবে। অধ্যক্ষ বললেন যে প্রযোজনার বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে তাঁরা একজন শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করতে চান। সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমারোহের সঙ্গে "চিত্রাঙ্গদা"-র অভিনয় হবে, একথা এখন নিশ্চয় করে বলা চলে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গীত পরিষদও শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের নতুন সঙ্গীত রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। সোভিয়েট সিনেমাতেও রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে এবং তাঁর রচনাকে কেন্দ্র করে নতুন চিত্র রচনার পরিকল্পনা হয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের সফর এবং বিশেষ করে তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" নানানভাবে প্রচারিত করবারও ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। তা ছাড়া, ১৯৬১ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে

এবং গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের নাটক, গদ্যপদ্য রচনা, সঙ্গীত এবং তাঁর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শতবার্ষিকী উদযাপনের বিরাট আয়োজন হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এ আগ্রহ স্বভাবতই আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যিকার কৌতূহল ও আগ্রহ সর্বত্রই দেখলাম। মস্কোর লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউটের কথা আগেই বলেছি। নাট্যশিল্প নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ প্রতিষ্ঠানটির স্থান খুবই উঁচু। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে তাঁরা কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় করতে চান। আধুনিককালে ভারতবর্ষে শকুন্তলার অভিনয় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বললাম যে গত দু-তিন বছর ধরে উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহের উদ্যোগে তাঁর বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে এবং সে অভিনয় সংস্কৃতে হলেও জনসাধারণ তা সাদরে গ্রহণ করে। সেই প্রসঙ্গে বললাম যে ১৯৫৮ সালে উৎসবের সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে শকুন্তলার অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়েছিল, শকুন্তলা পরিবেশন করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। অধ্যক্ষ বললেন যে কালিদাসের নাটকের দৈর্ঘ্য নিয়ে তাঁরা ভাবনায় পড়েছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের দর্শকবৃন্দ দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশী নাটক দেখতে হয়তো চাইবে না। তাঁকে বললাম যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। উজ্জয়িনীতে শকুন্তলার যে অভিনয় হয়েছিল, তা-ও বোধ হয় আড়াই ঘণ্টার বেশী সময় নেয়নি।

কেবল লুনাচারস্কি ইনস্টিটিউট বলে নয়, রবীন্দ্রনাথের মতন কালিদাসের বিষয়েও আগ্রহ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যাপক। সোভিয়েট সঙ্গীত পরিষদ শকুন্তলাকে সঙ্গীতরূপ দেবার চেষ্টা করছে এবং পরিষদের সভাপতি বললেন যে কালিদাসের রচনা পাঠ করে তাঁরা যে আনন্দ পান, বর্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে প্রায় কারু রচনাই ততখানি আনন্দ দেয় না। নৃত্যনাট্যে পুরাতনের প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুরাগের কথা আগেও বলেছি, দেখলাম যে এ পুরাতন প্রীতি কেবলমাত্র রুষ নৃত্যনাট্যে সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গীত পরিষদের সভাপতি বললেন যে তাঁরা সম্প্রতি লায়লা মজনুর কাহিনী নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, এবং সে নৃত্যনাট্য যে সমাদর পেয়েছে তাতে শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছে। লায়লা মজনুর সঙ্গীত শোনালেন, তার মধ্যে প্রাচ্য সঙ্গীত ভঙ্গীর আমেজ রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ নৃত্যনাট্যটি ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার তাঁরা নতুন করে ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতে সুর দিয়েছেন। বললেন যে এখন নতুন নতুন ভারতীয় রচনা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করতে চান। মস্কো থেকে ফেরবার পরে আমাকে জানিয়েছেন যে আমার "সাথী" বইটির একটি কবিতা 'রাখালকে তাঁরা সঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগের আয়ো দুয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। মস্কোতে "মুদ্রারাক্ষস"-এর যে অভিনয় হয়েছিল, তা আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু ভারতীয় যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা একজন ভারতীয় মনীষী আমাকে বললেন যে "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেছে। "মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখবার আগে পর্যন্ত তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন, বলতেন যে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে পদে পদে ব্যাহত করা হয়েছে, মানুষের জীবনের মূল্য বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে, তিনি তাকে কখনোই স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু "মুদ্রারাক্ষস"-এ বিদেশী সংস্কৃতি

এবং জীবনাদর্শকে যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে তা দেখে তাঁর মনে হল যে পূর্বে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে মানুষের মর্যাদা নতুন করে স্বীকার করবার চেষ্টা হয়েছে।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আগের বা পরের কোনো মতই আমি পুরোপুরি মানতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে ব্যক্তি চিরদিনই নিয়মকে লঙ্ঘন করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, চিরদিনই দৈত্যকুলেই প্রহ্লাদের জন্ম হয়। তাই স্টালিনের আমলেও সোভিয়েট নরনারী রাষ্ট্রের লৌহশাসনের মধ্যেও স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যের চরম বিকাশ দেখিয়েছে। আজ মিঃ ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে পুরনো কড়াকড়ি বহুল পরিমাণে কমে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসনের বন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ সাম্যবাদী হোক অথবা গণতান্ত্রিক হোক, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায়ই চিরদিনই শাসনের বন্ধন কমবেশী থাকবে। আসলে পৃথিবীতে আজো সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারবার গণতন্ত্র স্থাপনের সাধনা হয়েছে কিন্তু ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ সে প্রচেষ্টাকে বারবার ব্যাহত করেছে। একথাও সত্য যে বর্তমান যুগের পূর্বে গণতন্ত্র স্থাপনের আর্থিক কাঠামো পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে মানুষ অভাবের ভিত্তিতেই সমাজ সংগঠন করেছে। একক ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে টিকতে পারে না, তাই গোষ্ঠী গড়ে উঠল। পশু সমাজেও গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে, কিন্তু সাধারণত বহু স্ত্রী এবং একটি নরের সমাবেশেই পশুগোষ্ঠী। যৌন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর করতে না পারলে বহুসংখ্যক সাবালগ পূর্ণযৌবন স্ত্রীপুরুষের সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং মানুষ সে সমস্যার চলনসই সমাধান করতে পেরেছিল বলেই মানুষের প্রগতি এত ব্যাপক ও দ্রুত। অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই যৌন সম্পর্ক অবাধ এবং বহুক্ষেত্রে সাময়িক, কিন্তু সেই সম্বন্ধকে সমাজ বন্ধনের মধ্যে স্থায়ী রূপ দিয়ে এবং স্বগোষ্ঠী বা স্বগোত্রের নারীকে বিবাহ-অযোগ্য করেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়তে পেরেছিল। আদিবাসী জাতির মধ্যে আজো তার পরিচয় স্পষ্ট, প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ হিন্দু সমাজেও গোষ্ঠী ও গোত্র বন্ধনের মধ্যে তারই ইংগিত মেলে।

সমাজ গড়বার পরেও কিন্তু বহুদিন মানুষের খাদ্যবস্ত্রের অভাব দূর হল না, বরং নতুন দাবীর সৃষ্টি হল। একদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অফুরন্ত, অন্যপক্ষে তার উদ্যম সীমিত, সম্পদ অত্যন্ত পরিমিত। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও বহুকে বঞ্চিত করে স্বল্পসংখ্যক লোক ঐশ্বর্য ও মর্যাদা ভোগ করছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমাজের সেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের সৃষ্টি। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও সেদিন ছিল না, তাই শিক্ষা বা জ্ঞান যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কারণ নেই। প্লেটো এরিস্টটলের মতন মানবধর্মী উদার দার্শনিক সেদিন বলেছেন যে সমাজে চিরকালই প্রভু এবং দাস থাকবে, এবং দাসপ্রথার ফলে যে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি, তার ব্যবহার করেই অভিজাত সম্প্রদায় চারুশিল্প, দর্শন বিজ্ঞান সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষে মনুসংহিতায়ও অধিকার ভেদের ভিত্তিতে মানুষের সাম্যবোধ অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত আদর্শই যে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরিস্টটলের লেখায় তার ইংগিত মেলে। "পলিটিক্স" বা রাজনীতি গ্রন্থে এরিস্টটল লিখেছেন যে যতদিন নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবে, ততদিন দাসত্ব প্রথা অনিবার্য, কিন্তু যদি কখনো এমন দিন আসে যে

মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্র নিজের শক্তিতে মানুষের দৈনন্দিন দাবী মেটাতে পারবে, সেদিন কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমে আসবে এবং দাসত্ব প্রথারও আর যৌক্তিকতা থাকবে না।

গত দুশো বৎসরের শ্রমবিপ্লবের ফলে এবং বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশ বছরের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে আজ সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে বসেছে। আজ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। পূর্বে দশজন লোক চরকা তাঁত চালিয়ে সারা বৎসরে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী করতে পারত, আজ যন্ত্রের সাহায্যে এক ঘণ্টায় একজন লোক তার শতগুণ বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। পূর্বে যে পথ অতিক্রম করতে বহু বৎসর কেটে যেত, আজ সেই পথে চলতে মানুষের ঘণ্টাভর সময়ও লাগে না। পূর্বে যে পাথর তুলতে বা সরাতে হাজার লোকের প্রয়োজন হত আজ যন্ত্রের সাহায্যে একটি বালকও তা অনায়াসে যেখানে খুসী নিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখি, শুনি, বহুদূরের মানুষকে সাহায্য বা সংহার করতে পারি। ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করবে, এ সম্ভাবনা আজ প্রথমবার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ জরা ও মৃত্যুকেও বহুল পরিমাণে স্ববশে এনেছে। চিরকালের সনাতন অভাবের সমাজের বদলে আজ পৃথিবীতে সর্বদেশের সকল মানুষের জন্য সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। তাই গণতন্ত্রের সম্ভাবনাও আজ প্রথম মানব ইতিহাসে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের সেই শাশ্বত মঙ্গল মানব আদর্শকে সাম্যবাদ যে পরিমাণে গ্রহণ করেছে, সেই পরিমাণেই সাম্যবাদ আদর্শবাদী তরুণের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আকর্ষণ করে।

আজ একথাও ভোলবার উপায় নেই যে মার্কস নিজে চরম আদর্শবাদী ছিলেন। মানবের কল্যাণ সাধনের প্রেরণায় সমস্ত জীবন দারুণ দুঃখ ও অভাব স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেকালের আদর্শবাদী উদার মানব-ধর্মকে ভিত্তি করেই তাঁর জীবন-দর্শন, শুধু সেই দর্শনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য যে হিংসাত্মক কর্মপদ্ধতি তিনি সেদিন নির্দেশ করেছিলেন, সেই কর্মপদ্ধতি বাদ দিলে তাঁর পূর্বের উদারপন্থী মানব-ধর্মী দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তিনি ইতিহাসের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়াকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর পূর্বে রিকার্ডোও সে কথা বলেছেন। মার্কস একথাও বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের মতন গণতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদ হয়তো বিনা রক্তপাতেই আসবে। একথা মেনে নিলে পৃথিবীর প্রায় সকল উদারপন্থী নরনারীই মার্কসের আদর্শবাদ গ্রহণ করতে পারে। গত একশো বছরের ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে কর্মপন্থা নির্দেশে মার্কস বহুক্ষেত্রে ভুল করেছেন। বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রগতি তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ভাবতে পারেননি যে মানুষের জ্ঞানের সম্প্রসারণে মানবসমাজ একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছবে যে হিংসা বা সংঘর্ষের পথ প্রগতির বদলে অবধারিত মৃত্যু টেনে আনবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নায়ক মিঃ ক্রুশ্চেভের অন্যতম প্রধান কীর্তি যে তিনি মানব-সমাজের এ প্রগতির অর্থ বুঝেছেন, এবং তাই মার্কস বা লেনিনের মতবাদের নির্বোধ ও অর্থহীন পুনরাবৃত্তির বদলে নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজতে এগিয়ে এসেছেন।

"মুদ্রারাক্ষস"-এর অভিনয় দেখে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মনোভাবের যে পরিবর্তন, তার আলোচনায় যে সব কথা এসে পড়ল, প্রথম দৃষ্টিতে তা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আধুনিক

যুগে সোভিয়েট নাগরিকের যে আগ্রহ, এ আলোচনার মধ্যে তার কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। মস্কোর কিশোর নাট্য প্রতিষ্ঠান রামায়ণ অভিনয় করতে চাইছে, বিদগ্ধ সমাজ "মুদ্রারাক্ষস" দেখে নিজেরা মুগ্ধ, বিদেশীকে মুগ্ধ করে, কালিদাসের শকুন্তলাকে নাট্যরূপ, নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়ার আগ্রহ, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে সরকারের এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য, গান্ধীর কর্মপন্থা ও মতবাদ প্রথম দৃষ্টিতেই একেবারে মার্কসবাদ ও মার্কসপন্থার বিরোধী, তা সত্ত্বেও আজ সোভিয়েট দেশে গান্ধীর সমাদর, যে টলস্টয় ডস্টয়ভস্কি এককালে উপেক্ষিত, অনাদৃত, আজ তাদের নতুন করে বোঝবার শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টা,—এ সমস্ত স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্র ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতির সমস্যা ও সমাধান নিয়েও সোভিয়েট নাগরিকের যথেষ্ট অনুরাগ। ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেবল ভারতবর্ষের নেতা বলে সমাদৃত নন, সোভিয়েট নাগরিক আজ তাঁকে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মধ্যে স্থান দিয়েছে এবং যে পরিমাণে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়েছে, তা অনেক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাও পাননি। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা যেভাবে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে কথা মনে রাখলে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তার আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্ময়কর মনে হয়। সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয়ে ভারতবর্ষের যে প্রভাব, এক আমেরিকা ভিন্ন অন্য কোনো ভিন্ন দেশের বেলা বোধ হয় তার পরিচয় মিলবে না।

আমেরিকা নিয়ে সোভিয়েট নাগরিকের উদ্বেগ ও আগ্রহ দুইই বোঝা যায়। বর্তমান যুগের পৃথিবীর নেতৃত্ব নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দুর্ভাগ্যবশত সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপকভাবে হিংসা ও শত্রুতার রূপ নিয়েছে। ফলে উভয় রাষ্ট্রের মনে ভয় যে প্রবল প্রতিপক্ষ অতর্কিত আক্রমণে জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সম্পদে, যান্ত্রিক অগ্রগতিতে বা সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা ও রুষদেশে ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, ভারতবর্ষের জীবন আদর্শই তার জন্য দায়ী। ভারতবর্ষ প্রধানত অহিংস উপায়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানও অহিংস উপায়েই করতে চেষ্টা করেছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা এবং সাধারণ নাগরিক উভয়েই তা দেখে বিস্মিত হয়। সাম্যবাদী দেশের সর্বনায়কদের মধ্যে একজন তো স্পষ্টভাবে বললেনই যে ভারতবর্ষের রাজামহারাজাদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে বারবার দেখা যায় যে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়ে নতুন রাষ্ট্রশক্তির কঠোর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে সে শত্রুতা বংশানুক্রমে তিন-চার পুরুষ ধরে অব্যাহত রয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে অভিজাত সম্প্রদায় শক্তি সম্পদ হারিয়েও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত ও দেশভক্ত প্রজা, এ অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হল, সে কথার বিচার করে মার্কসবাদের মূলনীতি নিয়ে তাঁকে আবার ভাবতে হয়েছে, একথাও একাধিক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা স্বীকার করেছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ সমালোচক এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন যে গত চার পাঁচ বছরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মতের কড়াকড়ি অনেকটা কমে গিয়েছে, শাসনের বজ্র আঁটুনিও খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে।

জওহরলাল নেহরু যখন প্রথম সোভিয়েট রাষ্ট্রে যান, তখন সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা করেছিল, বোধ হয় লেনিনের মৃত্যুর পরে কোনো সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। সামরিক শক্তিতে দুর্বল, অর্থবলে দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর জন্য সোভিয়েট নাগরিকের এত শ্রদ্ধা ভালবাসার কারণ কি, এ কথার আলোচনা করলে বোঝা যায় যে রণ ক্লান্ত হিংসানীতিশ্রান্ত শান্তিকামী সোভিয়েট জনসাধারণ তাঁর আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করেছে, স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির প্রত্যক্ষ সমালোচনার সুযোগ বা সাহসের অভাব ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছে, দেশের নায়কদের বলতে চেয়েছে যে তোমরাও যদি ভারতবর্ষের নীতি অবলম্বন কর, তবে কেবল ভয়ার্ত আজ্ঞাবহ না হয়ে আমরা তোমাদের সশ্রদ্ধ ও অনুরাগী অনুচর ও সহকর্মী হব। মিঃ ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতা সোভিয়েট রাষ্ট্রে পণ্ডিত নেহরুর অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য অভিনন্দন দেখে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ভেবেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সন্দেহ তাঁর ভারত আগমনের পরে দূর হয়ে গিয়েছে। এদেশে আমাদের রাষ্ট্র নেতাদের অকুণ্ঠিত ও অবাধ চলাফেরা, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের যোগ নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ কথাও অনস্বীকার্য যে মিঃ ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আসবার পর থেকেই সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন শুরু হয়েছিল।

মৌলিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেমন ভারতবর্ষের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারে, শিখেছে এবং শিখছে, ভারতবর্ষও ঠিক তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও সাধনা থেকে অনেক শিখতে পারে, শিখেছে এবং শিখবে। বহুযুগের জড়তাকে স্বচেষ্টায় নিজের উদ্যমে যেভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র জয় করেছে তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের বাহ্যিক প্রকাশগুলিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সোভিয়েট লুনিক সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, সোভিয়েট পতাকা চন্দ্রে পেঁাছে গিয়েছে, এসব জিনিস স্বভাবতই আমাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই যে সমগ্রজাতির মধ্যে জ্ঞানসাধনার নবীন আগ্রহ ও উদ্যম সঞ্চারিত করতে না পারলে এসব কীর্তি সম্ভব হত না। শিক্ষা যেভাবে সমগ্র সোভিয়েট দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সেকথা আগেও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন মানুষের নির্মাণ সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী সাধনা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে শিল্পে যে সংগঠনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি তারও ভিত্তি এই শিক্ষণ মনোবৃত্তি। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু মনে হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র সজ্ঞানে সে ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছে।

শিল্পসৃষ্টিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র কতখানি দখল দেবে, এ বিষয়ে আবহমান কাল থেকে মতভেদের অন্ত নেই। প্লেটোর কথা স্বভাবতই মনে আসবে, কিন্তু একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে পূর্বকালে রাজানুগ্রহ না পেলে কবি বা সাহিত্যিক বাঁচতে পারত না এবং রাজাকে তুষ্ট না করলে সে অনুগ্রহ মিলত না। তবু সাহিত্য, চারুকলা বা সঙ্গীত প্রধানত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাই তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ততটা মারাত্মক হয় না, আর বেশী হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা চলে। নাট্যশিল্পের বেলায় সামাজিক ফলাফল অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, তাই নাট্য এবং সমাজের চিত্ত বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমের উপর সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদাই দখল দিতে চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগে সিনেমা বহুল পরিমাণে নাট্যশিল্পের জায়গা দখল করে নিয়েছে, তাই সিনেমার ক্ষেত্রে সমাজ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে এটা বোধ হয় আশ্চর্য নয়। তাছাড়া সিনেমায় শিল্প এবং ব্যবসায়ের অনুপাত নিয়ে অনেক

সময়ে মুস্কিল বাধে। ভারতবর্ষেই আমরা দেখেছি যে এককালে শিল্প হিসাবে শুরু হলেও বর্তমানে সিনেমাকে ব্যবসায়ের পর্যায়ে ফেলাই বোধ হয় সংগত। অবশ্য এখনো সিনেমার জগতে শিল্পীর পরিচয় মেলে, তা নইলে বোধ হয় সিনেমাও বেঁচে থাকতে পারত না, কিন্তু অধিকাংশ সিনেমার ছবিই আজকাল যারা সিনেমা হল ভাড়া দেয়, সেই সমস্ত ব্যবসায়ীর করুণা নির্ভর। তা ছাড়া সিনেমার প্রসারের সম্ভাবনা প্রায় অপরিমিত। নাট্যশিল্পে অভিনেতা বড় জোর হাজার দর্শকের সামনে বৎসরে তিন'শ বার উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু সিনেমা চিত্র একবারেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সিনেমা হলে একই সংগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন তিন চারবার করে দেখতে পারে। তাই সিনেমার মধ্য দিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করবার শক্তিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে। প্রায় সকল দেশেই তাই সিনেমার ছবির যাচাই করা হয়, সব ছবি সকলকে দেখতে দেওয়া হয় না। কোনো কোনো ছবি রাষ্ট্রের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমনিতেই নিয়ন্ত্রণ বেশী। কাজেই সিনেমাচিত্রের বেলায় যে রাষ্ট্র চিত্রের পরিচালনা, উৎপাদন এবং পরিবেশনকে নিজের হাতে রাখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সোভিয়েট ছায়াচিত্র তাই পুরোপুরিভাবে দর্শকের রুচি নির্ভর নয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয় কোন ছবি তৈরী করা হবে, কোথায় কতদিন দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য, ছায়াচিত্রের বেলা প্রায় সব দেশেই কেবল দর্শকের রুচি দিয়ে চিত্রের ভাগ্য নির্ণয় হয় না। আজকাল নগরবাসীর একটি বিপুল অংশ সপ্তাহে একবার কি দুবার সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত—যে ছবিই দেখানো হোক না কেন, তারা ছবি দেখতে যাবেই। কাজেই যারা সিনেমা হল নিয়ন্ত্রণ করে, তারা প্রায় খুসী মতন যে কোনো ছবিই দেখাতে পারে। অবশ্য দর্শকের রুচি ষোলো আনা অগ্রাহ্য করা চলে না, কিন্তু সময় সময় আমাদের দেশে অথবা আমেরিকায় সিনেমা ব্যবসায়ীরা যে দর্শকের দোহাই দিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচি ও অপরিণত মনোবৃত্তি প্রসূত বাজে বা ক্ষতিকর ছবির সাফাই দিতে চেষ্টা করে, তা একান্তই অযৌক্তিক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাই সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের মর্জিমাফিক ছবিই উৎপাদিত হয়, দেখানো হয়। দুয়েকবার এমনো হয়েছে যে ছবি দেখাতে শুরু করে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তা সহসা বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণে আশঙ্কা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু সংগে সংগে তার ফলে খুব খারাপ বা কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখবার সম্ভাবনাও অনেকখানি কমে আসে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষের যৌন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে সিনেমাতে এসে পড়েছে, বহু ক্ষেত্রে তা শালীনতার সীমাও পেরিয়ে যায়, কিন্তু সোভিয়েট ছায়াচিত্রে কখনো সে ধরনের অসংযম দেখা যায় না। একথা বোধ হয় সত্য যে সোভিয়েট ছায়াচিত্রের সাধারণ মান বেশ উঁচু, পৃথিবীর অনেক দেশের ছায়া-চিত্রের তুলনায় অধিকাংশ সোভিয়েট ছায়াচিত্র শিল্পসম্পদে উৎকৃষ্ট, কিন্তু মহত্তম ছায়া-চিত্রের বেলায় সোভিয়েট সিনেমাশিল্প বোধ হয় জাপান বা ফরাসী বা হলিউডের শ্রেষ্ঠতম অবদানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন।

সোভিয়েট দেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপরিমিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানেও দর্শকের রুচিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। ইংরাজিতে কথা আছে যে ঘোড়াকে টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া চলে কিন্তু জোর করে জল খাওয়ানো যায় না। সোভিয়েট রাষ্ট্রেও তার পরিচয় দেখেছি। সোভিয়েট ফিল্ম অথবা টেলিভিশনে প্রচার কার্য বেশ জোরালো-ভাবে হয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রে তার ফল হয় উল্টো। আমি নিজে দেখেছি যে টেলিভিশনে

যেই প্রচারবার্তা শুরু হল, হয় গৃহকর্তা টেলিভিশন বন্ধ করে দিল, অথবা অধিকাংশ দর্শক সেখান থেকে উঠে চলে গেল। একজন সোভিয়েট নাগরিক তো স্পষ্ট বললেন যে প্রথম যেদিন টেলিভিশনে শুনলাম যে অমুক নদীতে বাঁধ বেঁধে এত লক্ষ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন খুবই খুসী হয়েছিলাম, গর্বও অনুভব করেছি, কিন্তু বারবার যদি সেই একই ধরনের খবরের পুনরাবৃত্তি হয় তবে তা আর কতদিন সহ্য করা যায়? তাই তখন নিজের বাড়িতে হলে টেলিভিশন বন্ধ করে দেই। হোটেলে রেস্তোরাঁতে বা অন্যের বাড়িতে হলে হয় উঠে চলে যাই, নয় বন্ধুবান্ধবের সংগে গল্প শুরু করে দেই।

দর্শকের রুচিমাফিক ছায়াচিত্র উৎপাদনের জন্য তাই রাষ্ট্রও চেষ্টা করে। যে কোন নাগরিক মর্জিমাফিক ফরমায়েস পাঠাতে পারে, অবশ্য সে অনুরোধ রক্ষা করা না করা কর্তৃপক্ষের এক্তেয়ার। ব্যক্তি বিশেষের ফরমায়েস হয়তো অগ্রাহ্য করা চলে, কিন্তু শিল্পী-সংসদ, লেখকগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সংস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেকটিভ ফার্ম থেকে অনুরোধ এলে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষকেও ভাবতে হয়। শিল্পী হিসাবে হোক অথবা কর্মী হিসাবে হোক, সিনেমাশিল্পে যারা কাজ করে, তাদের অনুরোধগুলিরও বিশেষ ওজন দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ সমস্ত মতামতে দেশের জনসাধারণের রুচিরও খানিকটা পরিচয় মেলে এবং কর্তৃপক্ষ সবদিক বিবেচনা করে এমন ছায়াচিত্র রচনার চেষ্টা করেন যাতে দর্শকের মনোতুষ্টি এবং সংগে সংগে রাষ্ট্রের আদর্শও প্রচারিত হবে।

সোভিয়েট সিনেমাশিল্পের আর একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশে যে শিল্পীদের নিয়ে বাড়াবাড়ি, চিত্রতারকা তৈরী করবার জন্য সমস্ত রকমের প্রচারকার্যের প্রয়োগ, সোভিয়েট ছায়াচিত্রে তার পরিচয় খুবই কম। এককালে তো অনামা চিত্রশিল্পীদের নিয়েই সোভিয়েট ছায়াচিত্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে চিত্রতারকাদের পরিচিতি অনেকটা বেড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হলিউডের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষকে বড় করবার চেষ্টা অনেক কম। বহুক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হয় এবং দুয়েকটি ছায়াচিত্রে অভিনয়ের পরে তারা আবার সাধারণ নাগরিকের জীবনে ফিরে যায়। হয়তো তার একটা কারণ যে এতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছায়াচিত্র রচনায় রাষ্ট্রের প্রচারণার দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বল্প সংখ্যক ছবিই সমস্ত দেশে দেখানো হত। ভারতবর্ষের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক কম ছায়াচিত্র প্রতি বৎসর পরিবেশন করে, একথা হয়তো কারু কারু কাছে আশ্চর্য মনে হবে। বর্তমানে ছায়াচিত্রের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে এবং তার ফলে একদিন হয়তো হলিউডের ছায়া সোভিয়েট সিনেমা শিল্পেও দেখা দেবে।

ভারতীয় ছায়াচিত্রের সোভিয়েট রাষ্ট্রে খুবই সমাদর, কিন্তু ঠিক যেমন সংগীতের বেলায় ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের চেয়ে আধুনিক ফিলমী গানই সোভিয়েট নাগরিকের হৃদয় বেশী স্পর্শ করেছে, ছায়াচিত্রের বেলায়ও আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ফিল্মেরই বেশী সমাদর। হয়তো তার একটি কারণ যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কঠোর জীবন আদর্শ এবং সোভিয়েট ছায়াচিত্রের তাপস মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ছবির অপ্রাকৃত অতিরঞ্জিত প্রেম কাহিনী তাদের আরো বেশী আকর্ষণ করে। কারণ যাই হোক না কেন, ভারতীয় ছায়াচিত্র এবং ভারতীয় ফিল্মী গান যে সোভিয়েট জনসাধারণের একান্ত প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বোধ হয় তার ফলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ একটু বিচলিত হয়েও

পড়েছেন। কারণ আমি যখন মস্কোতে ছিলাম, তখন আমাদের সফির শ্রীমেনন একদিন অনুযোগ করলেন যে ভারতীয় ফিল্মের সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবেশে নানা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অবশ্য তখনি বললেন যে তাঁরা চান যে আরো বেশী ভারতীয় ছায়াচিত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে আসুক এবং সরকারের তরফ থেকে যাতে বাধা না থাকে, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

রাষ্ট্রনেতাদের মতামত যাই হোক না কেন, জনসাধারণ যে ভারতীয় ছায়াচিত্র দেখতে চায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শ্রীরাজকাপুর এবং শ্রীমতী নার্গিসকে সোভিয়েট দেশের সিনেমা দর্শকেরা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের উল্লেখ করে এবারের মতন আলোচনা শেষ করছি। বিশেষজ্ঞদের কোনো এক সভায় যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষের কয়েকজন মনীষী তাসকন্দ হয়ে মস্কো যাচ্ছিলেন। তাঁরা সবাই খ্যাতনামা, নিজের নিজের ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাসকন্দে প্লেন থেকে নামবার সময় দেখলেন যে বিপুল জনতা সাগ্রহ প্রতীক্ষা করছে। তাঁরা বেরিয়ে আসতেই শুনলেন জয়ধ্বনি 'হিন্দী রুষী ভাই ভাই'। দেখলেন যে ভারতবর্ষের তেরাঙ্গা পতাকার ছড়াছড়ি। তাঁদের খুবই ভাল লাগল, ভাবলেন স্বদেশে কোনদিনই এ ধরনের অভ্যর্থনা তাঁদের মেলেনি। সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের এ নিদর্শন দেখে খুবই খুসী হলেন। একটু কাছে এসে দেখলেন কতগুলি ছবিও রয়েছে। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই সিনেমায় বড় বেশী যান না, তাই ছবি দেখে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু সমবেত জনতার মধ্যে কয়েকজন এগিয়ে এসে রাজকাপুর এবং নার্গিসের জয়ধ্বনি দিল, তাঁদের জিজ্ঞাসা করল যে রাজকাপুর কোথায়? নার্গিসি এখনো বেরিয়ে আসেন নি কেন? জনতা যখন শুনল যে সে প্লেনে নার্গিস বা রাজকাপুর নেই, তখন পণ্ডিত ও সুধীদের নিরাশ করে সমবেতভাবে তারা সবাই ফিরে গেল। 'হিন্দী রুষী ভাই ভাই' জয়ধ্বনিও থেমে গেল।

গল্পটি সত্য কিনা জানি না, কিন্তু এ ঘটনা না ঘটে থাকলেও ঘটতে যে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কবিতা

কলকাতার বোধিসত্ত্ব

আনন্দ বাগচী

দেওয়ালে লেপ্টে আছে বিপন্ন বধির অন্ধকার,
বাইরে ঘনবৃষ্টি ঝরে, দমকা হাওয়া প্রচণ্ড ধমকে
সহর শাসন করে জলস্রোতে মজে বাঁকা গলি,
সঙ্কীর্ণ আলোর বৃত্তে বোধিসত্ত্ব একা জেগে আছে
মেপে জুকে দেখছে তার আত্মজীবনীর খসড়াখানা,
দর্পনের কাঁচঘরে শেষবার প্রিয়তম মুখ
নির্জন ফুলের মত ফুটে উঠছে আজন্ম-যৌবনে।
তার কড়চা গ্রন্থে সব স্বাক্ষরিত স্মৃতিচিহ্ন আছে
বহু নাটকীয় গল্পে, গল্পহীন অনেক নাটকে
মৃতদেহ নিয়ে কত খেলা হলো, কান্নার সাঁকোয়
কত পরস্পর ছায়া পার হলো নিভৃত হৃদয়ে,
কত কণ্ঠলগ্ন প্রেম, পথহাঁটা, স্বপ্নের ভিতর
আত্মঅন্বেষণ আজ আত্মহননের মত লাগে;
বোধিসত্ত্ব বলেছিল একদিন সমস্ত নারীকে
আদিম বৃক্ষের মত যৌবনের অসীম স্পর্ধায় :
'ফিরিয়ে দেব না কিছু, হে রমণী, আলিঙ্গনে চূর্ণ করে দেব।
ওষ্ঠে ওষ্ঠে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে পথিকে ধাধিতে,
পতঙ্গের মত তুমি অন্ধ হয়ে এসো প্রিয়তমা,
চতুর্দিকে শিলাখণ্ড, হিংস্র কণ্টকের সমারোহ
সর্বাঙ্গে যৌবন এনো এক রজনীতে শূন্য হতে,
আচ্ছন্ন চেতনা ভরে জ্বলবে শুধু প্রবল বর্ষণ,
নীরন্ধ্র ঘরের মধ্যে এসো এসো আমার প্রতিমা

নিসর্গ নিহত রক্তে, স্নায়ু জুড়ে বারুদের ঘ্রাণ।
ফিরিয়ে দেবনা কিছু, হে রমণী, চিরকাল যা এনেছ তুমি
যা কিছু গরল, মৃত্যু, পাপ, দ্বিধা চূর্ণ ক'রে দেব।'

সঙ্কীর্ণ আলোর বৃত্তে এখন চোরের মত বোধিসত্ত্ব জাগে
চূর্ণ হয়ে গেছে দম্ভ, পাশার ছকের মত অন্ধকার পাতা,
তার কড়চা গ্রন্থে সব স্বাক্ষরিত স্মৃতিচিহ্ন আছে,
কলকাতা চোখের জল এবং চোখের বালি একসঙ্গে করা,
নিঃসঙ্গতা সবশেষে, বিষণ্ণতা প্রতিমার মত পূজনীয়॥

পয়ঃস্বিনী

মৃগাঙ্ক রায়

ভোর দাঁড়িয়ে আছে পথের মোড়ে
বলেছিলে তুমি আসবে
সারারাত অন্ধকার দাঁড়িয়েছিল পথ জুড়ে॥

তোমার ছড়ানো হাত
একখানি সবুজ পাতা
একটি ছায়াগাছ বাড়ছে
আমার ঘরের দেয়ালে
দুখানি পাখার উড্ডীন কালো
তোমার দুচোখ বেঁধেছে।

তুমি এসো, আমার দক্ষিণ দুয়ারে হাওয়া
তুমি এসো, আমার প্রাক্তন প্রেমে অন্ধকার
তুমি এসো, পয়ঃস্বিনী পৃথিবী ঋতুগন্ধী॥

আমার চোখের নিচে তোমার চোখ
এক একটি দিন এক একটি ভিন্ন দৃষ্টি
এক একটি রাত ভিন্ন মুখ
তার তরঙ্গিত কণ্ঠনালী প্রতিদিন
নতুন অন্ধকার॥

কুয়োর পাড়ে জলের শব্দ
ঢেউয়ের নীল পিঠের মতো আকাশ
বৃষ্টিভেজা খড়ের গন্ধ মাঠে
পাঁচটি পামগাছ ঘিরেছে আমাদের
অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যা হবে
পাখায় অন্ধকার আনবে পাখী
আমার হাত প্রবাহিত হবে
তোমার হাতে
আমি তোমার মধ্যে ক্ষরিত হবো
দিনান্তরজনী॥

আমি আছি সেই মধ্যবৃত্তে তুমি
যার নীলনাভি।

রাত আসছে, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে,
পাহাড়ের লাল পিঠের ওপর পা দিয়ে। রাত
আসছে, লুপ্ত ধ্বনির জিহ্বা নড়ে উঠছে,
অন্ধকার তাকিয়ে আছে তোমার দিকে আমার দিকে
আমাদের শ্বেত মূর্তির দিকে।

আমি তোমার মধ্যে প্রোথিত,
আমার উরুতে তোমার বালুগ্রাস, আমার
আঙুল তোমার আঙুলের জংঘায় জড়িত।
তোমার মধ্যে আমার জন্ম, স্বপ্নস্বেদমৃত্যু।

রাত আসছে, অঞ্জলি পেতে
আমার প্রবাহমুখ ধারণ করো॥

কে যেন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এই জলে ঢেউ তুলে কে যেন হঠাৎ
চকিতে মিলিয়ে গেছে।
স্থির হৃদে বৃত্ত আঁকে
রঙীন বুদ্বুদ—তার নাম,
চকিতে মিলিয়ে যায় জলের আলপনা।

এই মগ্ন অন্ধকারে কে যেন নিমেষে
চুপি চুপি কথা কয়ে গেছে।
অরণ্যের শাখাগুলি মাথায় মাথায় এক হয়ে
তাই নিয়ে কাণাকাণি করে;
এখনো বাতাসে ভাসে ফিস্‌ফিস্‌ সে গলার স্বর।

এ নির্জন ঘরে এসে পা টিপে পা টিপে
আধ-খোলা দোর দিয়ে
কে যেন এসেই চলে গেছে;
অসতর্ক মন তার অস্তিত্বের পায়নি নাগাল।

আধ-খোলা দোরের মতন
চিড় খেয়ে গেছে যেন হৃদয়ের এই নির্জনতা।

কৈশোরের প্রতি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

যদি বলো যেতে পারি মাঠে, কিংবা শান্ত সমতলে।
উপরে ডেকো না অই উত্তরের পাথুরে পাহাড়...
গর্বিত লেগুনে, কিংবা ভয়ানক শব্দের জঙ্গলে।
তেমন উন্নত নই, হাতে নেই দাম্ভিক কুঠার।

দেখ, দেখ কত অল্পে ছায়াপথ... সাজানো সংসার
ফুটে আছে জ্যোৎস্নাবনে, শাদা-শাদা, চিত্রল নীরব—
মায়াবী জলের ফুল খুব আস্তে আনে অন্ধকার।
কোথা দর্প ... কোথা ডাকো, বক্ষে নেই তেমন সৌরভ।

কিছু এই রোগমুক্তি, কিছু অই আসক্ত বাতাস
অন্তত আমারে দাও। ক্লান্ত, বাঁকা, বিষিত শরীর
জটিল শয়নে বদ্ধ—একা আছি অন্ধ শোকোচ্ছ্বাস;
আমারে গ্রহণ করো যুগল বাহুতে রজনীর।
উপরে ডেকো না তুমি সূর্যোদয়ে বিহ্বল আকাশ,
আঁধারে নিদ্রিত আছি...এসো লজ্জা, প্রথম, মদির।

ইতিবৃত্ত

স্যাঁ-জন্ প্যার্স

মহাকাল, আমরা এসেছি পৃথিবীর সব উপকূল থেকেই। অত্যন্ত প্রাচীন জাতি আমরা, আমাদের মুখে কোন নাম পাবে না। যে যে মানুষ ছিলাম আমরা এককালে,—কার তার অনেক কথাই জানে!

দুরান্তের নানা পথ দিয়ে নিঃসঙ্গ আমরা হেঁটে এসেছি; আর অপরিচিত সাগরের পর সাগর আমাদের ব'য়ে এনেছে। আমরা চিনেছি ছায়া আর তার পাপ্মাগ্রস্ত প্রেতাত্মাকে। আমরা দেখেছি সেই আগুন, যার টানে পথ হারাতো আমাদের জন্তুগুলো। আর আমাদের লোহার পাত্রে আকাশ ধারণ করল রুদ্ররোষ।

মহাকাল, এসেছি আমরা। আমরা চাইনি গোলাপ, চাইনি অ্যাকান্থাস। কিন্তু এশিয়ার মনসুন আমাদের চাবকিয়েছে, ধেয়ে এসেছে আমাদের চামড়ার নয়তো বেতের বিছানা অবধি, এনেছে তার ফেনার দুধ আর চুনের জল। পশ্চিমে উৎপন্ন কত-না নদ চারদিনে গিয়ে হাজির হয়েছে সাগর-সঙ্গমে—সবুজ তাদের পঙ্কিমাটি-ঘন অম্লরস নিয়ে।

আর, লাল-মাটির ওপর যেখানে সবুজ সবুজ ক্যান্থারিস মাছি উড়ে বেড়ায়, শুনেলাম সেখানে একদিন উষ্ণ বর্ষণের আগমন-ধ্বনি।

অন্যত্র, মনিবহীন অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়ার বদলে নিয়ে নিল আমাদের পশমী তাঁবুগুলো। দেখেছি আমরা মরুভূমির বামন মৌমাছি। আর দ্বীপপুঞ্জের বালিতে, জোড়ায় জোড়ায় দেখেছি কালো ছিট দেওয়া লাল লাল পোকা। শহরে শহরে আগুন যেচে রাত্রির প্রাচীন অজগর আমাদের পথ চেয়ে শুকিয়ে রাখেনি তার রক্ত।

আর, আমরা বোধ হয় ছিলাম সমুদ্রের বুকে, সেই সূর্যগ্রহণের দিনে, প্রথম সেই অবাধ্যতার দিনে, যখন আকাশের কালো নেকড়েটা কামড়ে ধরল আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচিত প্রাচীন গ্রহটার হৃদয়। আর ধূসর সবুজ সেই গুহার অতলে, বীজ বোনার গন্ধে মুখর যেখানকার রঙ নবজাতকের চোখের মত, নিরাবরণ আমরা স্নান ক'রে উঠলাম—প্রার্থনা-রত : এই সর্বমঙ্গল এল যেমন অমঙ্গলের রূপে, অমঙ্গলও আসুক তেমনি সর্বমঙ্গলেরই রূপ নিয়ে। (*Chronique* থেকে)

[মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

কনখল

মনীশ ঘটক

নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি, অব্যাহত সুখ, স্থায়ী হয় না জীবনে। স্থিতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে না মন। উন্মেষ-মুখর চিত্ত দয়েলখঞ্জনের মতো নেচে কুঁদে দাপাদাপি করে চলতে চায়। কনখলকে গতির চুম্বক টানে—দুর্বার সে আকর্ষণ, গন্তব্যের কোনো দিশারা নেই। ভয়ের বোধ এখনো জাগেনি, তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা কনখলের অজ্ঞাত। বিজয়ীর গৌরবে বিপদ অতিক্রম করে আসা ওর যেন সহজাত সংস্কার।

সহপাঠী বা সমবয়সীদের সামনে, স্কুলে শাস্তি পেয়েই হোক বা খেলায় হেরে গিয়েই হোক, অপদস্থ হবার গ্লানি কিন্তু কনখলকে শঙ্কিত করে। তবে স্কুলের আবহাওয়ায় সে শঙ্কাও কেটে আসে। শাস্তির লাঞ্ছনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মধ্যে যেন আত্মত্যাগের মহিমা আছে, অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর বীরত্ব আছে, এমনি মনে হয় ওর। স্কুলে ভূগোলমাস্টার গোপালবাবু ছাড়া আর সব স্যারেরাই যেন এক একটি জগ্গীলাট—খালি তম্বী, আস্ফালন, আর হুকুমদারী তামিল না করলেই সাজা। ক্লাসে ওপারের সেই বেশী-বয়সী ছেলেটি, যার নাম মাতব্বর, একদিন চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝেনি, বুঝিয়ে দিতে বলেছিল খগেন স্যারকে। তিনি অঙ্ক ত বোঝালেনই না, খামখা গালমন্দ করে অতোবড় ধাড়ী ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিলেন বেঞ্চির ওপর।

কনখল বোঝে না, মাতব্বরের দোষ কোথায়। ভাবে, এত ভারী অদ্ভুত! পিরিয়ড ফুরিয়ে গেলে শাস্তিও শেষ হবে, কিন্তু অঙ্কটা না বোঝাই থেকে যাবে মাতব্বরের। সেও ত নিজে না বুঝলে মাকে সব জিজ্ঞেস করে। মাতব্বরের হয়ত তার মায়ের মতো মা নেই, কিন্তু স্কুলেও ত জানতে, শিখতে, বুঝতে আসে ছেলেরা। খগেন স্যার এ সহজ কথাটা কেন বোঝে না, ভেবে পায় না। মন বিরূপ হয়। শাস্তি? ভয়? ফুঃ!

যা কিছু বারণ, অজ্ঞাতসারে তার প্রলোভন যেন দুর্জয় হয়ে ওঠে। যা কিছু গোপন, তার ঢাকা খুলে দেখার আগ্রহ মনকে অধীর করে। হাজারো বিধিনিষেধের গোলকধাঁধায় মন ঘুরপাক খায়, কিন্তু হার মানতে চায় না। ধমক, ভয়, শাস্তি, বারণ, গোপন—অনেক শত্রু। ও যে লড়ছে, তাও ওর বোধের অতীত। জানতে পারে না, তাঁর আবেগ চাপতে গিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে সুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে বলা দু চারটে কথা কখনো সখনো নিভাননীর কানে গেছে। স্বপ্নে কথা বলছে মনে করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন তিনি। হয়ত হজম হয়নি, পেট ফেঁপেছে, দুঃস্বপ্ন দেখছে। পেটে টোকা দিয়ে ঢ্যাবঢ্যাব করছে কিনা পরখ করেছেন। নাঃ, সে সব কিছু নয়। নির্দোষ দেয়ালা মনে করে আমলে আনেন নি।

আয়েষার সাথে রোজ দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ করা হয়েছে। প্রয়োজনও মিটেছে বোধ হয়। দু'জনেই দু'জনাকে জেনেছে, চিনেছে। কিন্তু আশ্বাসের অনুরাগে আয়েষা অননুভূত রসের স্বাদ পেয়েছে। বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পর থেকে দেখাসাক্ষাৎ নেই বললেই চলে। আবরু কড়া হয়ে উঠেছে, কুলসম আর আয়েষাকে ঘর থেকে বেরুই হতে দেন না। জানলার সার্শী ফাঁক করে আব্বাস আসতে যেতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে

আয়েষা, বন্ধ একা ঘরেই গাল লাল হয়ে ওঠে। কোন মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়া লেগেছে যেন, দেহ মনে তরতর করে বেড়ে ওঠে আয়েষা। ম্যাজিকওয়ালার আমগাছের মতো। বীজ পোঁতা, গাছ বাড়া আর ফল ধরা সব যেমন দুমিনিটে হয়।

কনখল আসবে না কেন, আসে। ছুটিছাটার দিনে কাঞ্চনের পিঠে চড়ে পোলো ময়দানের ধারাটিতে এসে দাঁড়ায়, হ্যাসেট যেদিন আসেন, খেলাতে নেন কখনো কখনো। এক সোয়ারী হয়ে খেলবার সুবিধে দিয়েছেনও দু'একদিন। ঘোড়ায় চড়া ও কেয়ার করে না, সার্কাসের খেলোয়ারের মতো ঘোড়ায় চড়ার কসরত জানা আছে ওর, কিন্তু বিপদ ঐ তিন মানুষ লম্বা পোলোর ডাণ্ডা নিয়ে। তাও মাঝামাঝি এক জায়গায় দুঢুমুষ্টিতে ধরবার কায়দা বাগিয়ে ফেলেছে। ব্রিগেডিয়ার রণছোড় সিং মনে মনে তারিফ করেন। হ্যাসেটকে বলেন,—লৌণ্ডাকো স্যাণ্ডহার্স্ট ভেজ দো। হ্যাসেট গোঁফ চুমড়ে হাসেন। বলেন— মাই ডার্লিং ডটার উইল নেভার স্পেয়ার মি। নিভাননীকে মেয়ের মতো ভালো-বাসেন তিনি। লড়ায়ে তালিমে ছেলেকে ঢোকালে খুশী হবেন না নিভাননী, মনে হয় হ্যাসেটের।

খেলার শেষে একবার আয়েষাদের বাড়ী হয়ে দরগামুখো রওনা দেয় কনখল। বাড়ী ফিরে নতুন নেশায় মাতে। সাইকেল। অমৃত কোথা থেকে একটা ছোটোখাটো সাইকেল এনেছে, তাতে চড়তে শেখায় কনখলকে। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগলেও গা শিরশির করে। অমৃত সীটের তলায় হাত দিয়ে সাইকেল ঠেলে, কনখল হাতল সোজা রেখে ব্যালান্স আয়ত্ত করে। মাঝে মাঝে হাত ছেড়ে দেয় অমৃত, কনখল দেখতে পায় না। ব্যাঙা দৌড়ায় সাইকেলের সাথে, কিন্তু ভয়ে ব্যাঙার বুক গুরগুরে করে। ব্রেক কষার কায়দা রপ্ত করতে পারেনি কনখল, পড়ল একদিন গাছে ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে। অমৃত ছুটে এসে হাত ধরে তোলে, বলে,—খুব লেগেছে নাকি রে?

লাগা স্বীকার করাটা পরাজয়, এ বোধ ঠিক আছে কনখলের। সগর্বে গায়ের ধুলো ঝেড়ে মাথা দুলিয়ে বলে,—লাগলেই হোলো! কিচ্ছু লাগে নি। বাঁ দিকের কানের লতিটা থেঁতলে গিয়েছে ব্যাঙা দেখে ফেলে। বলে,—লাগেনি আবার! কানটা ত গেছে, দেখি ত মাথায় কোথাও কেটেছে কিনা। অমৃত বলে,—ব্যাড্, ভেরী ব্যাড্। ব্যাঙা, যা ত, গোটা-কত গাঁদা পাতা পুকুরে ধুয়ে নিয়ে আয়। ব্যাঙা ছুট দেয়।

ইঁটের ওপর ইঁট দিয়ে ঠুকে গাঁদা পাতার নির্যাস তৈরী হয়। ক্ষতে লাগিয়ে কোঁচার খুঁটে ছেঁড়া এক ফালি ত্যানার পটি লাগায় অমৃত। বলে,—ও তোর দু'দিনেই সেরে যাবে, তবে মাসিমা জানলে আর আস্ত রাখবেন না। নাঃ, কাঁদিস আর এমুখো হচ্ছি না।

কনখল বলে,—আচ্ছা অমৃত, আমি বলছি মা কিছু বলবেন না। ওই ব্যাঙাকে জিজ্ঞেস কর, মাকে গিয়ে সব খুলে বললেই হোলো। মার কাছে না লুকোলে মা কিছুতেই রাগ করেন না। সেই পাখী ধরার দিন মনে নেই ব্যাঙা? তোর হাতটা ত খুবলে খেয়েছিল মাদী কোকিলটা। মা খালি উড়িয়ে দিলেন, কই বকেন নি ত? ব্যাঙা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ছুটির বার, কিন্তু বিকেলের খেলায় ফাটা কান নিয়ে যোগ দিতে পারে না কনখল। ব্যাঙাকে একসাথে নিয়ে খেলার মর্যাদা এখনো দেয়নি ছেলের দল। কিন্তু ব্যাঙা স্কুলে ভর্তি হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, এখনো ওকে বাদ দেওয়া হবে কেন, ভাবতে খারাপ লাগে কনখলের। মার দিকে তাকায়, মা যেন বোঝেন ওর মনোভাব। বলেন,—আজ ব্যাঙা

খেলবে কংখের বদ্‌লী। আমি জানলায় বসে দেখব। হ্যাঁ রে অমৃত, তোদের গীতা-সোসাইটির মামলা নাকি মিটমাট হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ মাসিমা। নিবারণ ছিল মূল আসামী। হ্যাসেট সাহেব বলেছেন ওর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ টিঁকবে না। বাদ্‌বাকী প্রকাশদা, অমূল্য, আমরা—আমরা ত শুধু আগুন নেভানো, লোক বাঁচানো, এই সবই করেছি। তবে কানাঘুষো শুনি, বেণী দারোগা নাকি পণ করেছে আমাদের সবাইকে জেলে পুরবে।

—প্যারীবাবুর কি হবে?

—উনিও খালাস হবেন। সন্দেহ আছে, প্রমাণ নেই। তারপর হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বলে—মাসিমা, হরেনবাবু উকীল, তিনি নাকি বলেছেন যে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর কথা, কি মতামতের আইনে কোনো দাম নেই। নতুন মাসীর সেই আপনাকে বলা কথা ছাড়া প্যারীবাবুর বিরুদ্ধে আর কোনো প্রমাণ নেই। সেই যে, আগুনলাগার দিন বলেছিলেন, গুদামে একটুও পাট ছিল না। বলেছিলেন তিনি আপনাকে, আপনি বলেছিলেন মেসো-মশাইকে, কনা শুনেছিল। কলকাতার কোম্পানীর সাহেবটাও নাকি তদন্ত করে তাই বলে গেছে। তবে হরেনবাবু বলেন, যে পাঁচফেরতা কানকথায় ফৌজদারী মামলায় সাজা হতে পারে না। খালাস হবেন প্যারীবাবু, তবে ওঁর অনেক ধারদেনা, বিষয়সম্পত্তি সব নাকি বিক্রী হয়ে যাবে।

অমৃত ছেলেটি দলের মধ্যে সাবালক, খাসা গুছিয়ে পূর্বাপর বর্ণনা করে যায়। এই পূর্বাঙ্গ নাটকে ছেলের অংশ তুচ্ছ নয় মনে করে অস্বস্তি বোধ করেন নিভাননী। মুখে প্রকাশ করেন না কিছু। বলেন,—যা তোরা খেল গে যা। ব্যাঙাকে খেলায় নিতে ভুলিস্ না অমৃত।

ছেলের সাথী, দাগী চোরের ছেলে, খিদ্‌মৎগার ব্যাঙা নিভাননীর কাছে যেন কনখলের সমপর্যায়ে উঠে গেছে। মায়ের মনের রহস্যই আলাদা।

বৈকালিক বৈঠকের আড্ডাধারী সবাই বাইরের বারান্দায় জমায়েৎ হয়েছেন। বিদ্যা-ভূষণ মশায় ফুলো গালে টিকেয় ফুঁ দিচ্ছেন। হরেন চাকী রহস্যবাহিত কোন ম্লেচ্ছ জলখাবারের কথা সলোভে ভাবছেন। দীক্ষা নতুন, তাই ঈপ্সা বলবতী।

বর্মা চুরোট ফুঁকতে ফুঁকতে দুচার কদম পায়চারী করে বাগচি এসে স্বস্থানে বসেন। নিভাননী পর্দার আড়াল থেকে হরেনবাবুকে ইসারায় ডাকেন। ত্বরিৎ পদে হরেনবাবু উঠে ভেতরে যান। বলেন—কি বলছেন বৌদি?

—ঠাকুরপো, আপনি নাকি প্যারীবাবুর পক্ষে ওকালতী করছেন?

—কে বল্‌লে? ওকালতী নয়, ওকালতী নয়। আমমোক্তার নামা আমায় দেননি প্যারীবাবু। তবে—মানে, আইনসঙ্গত সাক্ষ্যপ্রমাণের রহস্যটুকু ফলাও করে জানিয়ে দিয়েছি কর্তাদের। জীবনের নতুন মার সেদিনকার কান্নাকাটি শুনে গেছি কিনা, মনটা কেমন মুষড়ে ছিল।

এই স্পষ্ট বক্তা কটুভাষী লোকটির সদয় অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে প্রীত হন নিভাননী। হরেনবাবু বলতে থাকেন,—আপনি ত বুদ্ধিমতী মহিলা, বৌদি, আপনিই বুঝুন। স্বামীর অনিষ্টকারী কোনো কথা ঘরোয়াভাবে স্ত্রী তাঁর কোনো বন্ধুস্থানীয়াকে বললেন। সেই বন্ধু আবার তাঁর স্বামীর কাছে কথাগুলো গল্পচ্ছলে শোনালেন। গল্প কানে গেল এক নাবালক বাচ্চার, এখন এই বাচ্চার শোনা কথার সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে কি দাম

থাকতে পারে? তেমন জোর মামলা খাড়া হলে উকীল ব্যারিষ্টার শিখিয়ে পড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়ে হলপ করে বলিয়ে দেবে যে তিনি আদৌ কিছু বলেননি ওধরনের। ব্যস্। না, না—ওসব ঘরোয়া বৈঠকের গালগল্পে মামলা খাড়া হয় না। আর তা ছাড়া, নাবালকের শোনা কথার দাম দিলে আপনাকে বাগচিকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। পারবেন সেটা?

—রক্ষে করুন ঠাকুরপো। মাগো, তাই কখনো কেউ পারে? ওসব ভয় নেই ত আর?

—না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও আশঙ্কার গোড়া থেকে সমূলে কেটে দিয়েছি।

নিভাননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন—নির্মলার সাথে আর ঝগড়াঝাঁটি করেন না ত?

—রামঃ, আবার। সেই আপনার যাবার দিন থেকেই সাদা নিশান। সন্ধি। তবে লক্ষ্য করছি, আমার যেমন রহমতের রসুই-এর ওপর লালচ বেড়ে উঠছে, ওঁরও তেমনি ঠাকুর পুজো, সাত্ত্বিক রান্নাবান্নার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। আজ ত সাফ বলেই এসেছি রাত্তিরে আপনার এখানে নেমন্তন্ন। বলে, যেন একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই নিভাননীর দিকে তাকান হরেনবাবু।

নিভাননীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন—নেমন্তন্নই ত। আমি তাই আপনি খাবেন বলে আগে থেকেই আয়োজন করেছি। আচ্ছা বসুনগে আড্ডায় গিয়ে, আমি এদিক দেখি। বলে, অসত্যভাষণের গ্লানি কাটতে বাবুর্চিখানার দিকে পা চালান নিভাননী।

কনখল ছাদে বসে খেলা দেখে। কানের ব্যথাটা বেশ জানান দেয় থেকে থেকে। শীত প্রারম্ভের পাহাড়ী পাখীরা দলে দলে অপেক্ষাকৃত সমতলে মরসুমী অভিযান করে আকাশ ছেয়ে, ঠায় তাকিয়ে দেখতে দেখতে মন কেমন উদাস হয়ে যায়। একটা শঙ্খচিল ঘুর পাক খেয়ে উড়তে উড়তে ওপরে, অনেক ওপরে, মেঘাবরণের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। পুজোর ছুটিতে দেশের নদীর নীল গেরুয়া দুই ধারা জলের সংমিশ্রণ দেখে এসেছে কনখল। প্রকৃতি বিলাস ও শারীরিক যন্ত্রণা তেমনি ওর অনুভূতির দুই কানা বেয়ে বয়ে যায়। উৎফুল্ল ও বিষাদ একসাথে মিশে নিছক ভাবালুতা থেকে যেন বাঁচায় ওকে, সম্বিৎ সজাগ রাখে।

দূরে রাস্তার বাঁকে হ্যাসেটের অশ্বারোহী মূর্তি দেখা যায়। বোধ হয় ওদের বাড়ীতেই আসছেন। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে কনখল ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে বলেন,—হ্যালো ইয়ং ম্যান;—

হারুণ আসবার আগেই ও ঘোড়ার লাগাম ধরে। হ্যাসেট আদর করে ওর পিঠ চাপড়ান। বাগচি এগিয়ে আসেন। বিদ্যাভূষণ, হরেনবাবু নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। ছেলের দল খেলা শেষে মাঠের কোণায় জটলা করছিল, এইবার যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। হারুণের হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে কনখল বাড়ীর ভেতরে যায়।

হ্যাসেট আসন গ্রহণ করে বলেন,—তোমার মনস্কামনা সফল হয়েছে বাগচি। সামনের মাস থেকে সরকারী ইস্তাহার ইত্যাদিতে তোমার নামের আগে মিষ্টার ব্যবহার হবে, হুকুম হয়েছে। কেমন, খুশী ত?

বাগচি মুখ কাঁচুমাচু করেন, অস্পষ্ট স্বরে বলেন,—আপনার দয়া। হরেনবাবু

আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন। বিদ্যাভূষণের মুখভাব নির্লিপ্ত।

হরেনবাবুর মুখভাব হ্যাসেটের চোখ এড়ায় না। ঝানু সিভিলিয়ান, বহুদিন এদেশে আছেন। পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পেতে হয় না। বলেন,—ওয়েল, বাগচি, যদ্দিন চাকরী করবে, সাহেবীটাহেবী কোরো, কিন্তু ওই ওপরপাত পর্যন্ত। চালচলনে, বেশ-ভূষায়। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালীই থেকো হে, সরকারের কাছেও সম্মান পাবে। তোমাদের সুরেনবাবু, রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু, বিপিনবাবু, এঁরা যাই বলুন, আর যাই করুন, মনে মনে সমীহ করি এঁদের। যে মাটিতে জন্ম, সেই মাটির রসে পুষ্ট হবে, তবে ত জীবনীশক্তি অটুট থাকবে! কি বলেন হরেনবাবু?

হরেনের বাক্‌রোধ হয়ে আসে। মনে মনে বলেন—সাহেব, তুমি ম্লেচ্ছ ও বিজাতীয়, কিন্তু ইচ্ছে করছে তোমার সবটুকু শ্রীচরণযুগলে কপাল ঠুকি। মুখে বলেন,—খাঁটি কথা স্যার। আর বাগচির সাধ্য কি, শেকড় কাটা কাঠখোট্টা হবার। বাড়ীতে তুলসীতলা আছে, শালগ্রাম আছেন,—

আবার মনে মনে বলেন হরেনবাবু—আর জীবন্ত লক্ষ্মীঠাকুরুণ আছেন। মুখে আবার বলেন,—বাইরে মডার্ণ বেঙ্গল হলে কি হয়, ভেতরে ঘোর সনাতনী। হাঁচি টিক্‌টিক্‌ মাকুন্দচোপা,—সব মানেন আমাদের বাগচি।

—হোয়াট—হোয়াট ইজ দ্যাট—

—এই কতকগুলো অশুভ সঙ্কেত স্যার। অমঙ্গলসূচক। শুভকাজে বেরোতে ওগুলোর প্রত্যেকটি বাধাই বাগচি মেনে থাকেন। মনটা ওঁর খাঁটি দেশের রসেই পুষ্ট জানবেন।

ভেতরে নিভাননী মুখে আঁচল চাপেন। বিদ্যাভূষণ ঈষৎ হাসেন। বাগচি দাঁত কিড়মিড় করে হরেনকে চিমটি কাটেন। হ্যাসেট প্রসন্ন লঘু করে দেন স্বভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণে। বলেন—ওঃ, ইন্‌অস্পিশাস সাইন্‌স্—ও সব দেশেই মানা হয়। আমাদের দেশের তেরো নম্বর আর কালো বেড়ালের কথা শুনেছ ত? ভারী অমঙ্গলের ব্যাপার। কত উচ্চশিক্ষিত লোক এখনো মানে। যাক্‌, আরও ভালো খবর আছে। পার্টিশন রদ হয়ে গেল। লর্ড কার্জনের সেট্‌লড্‌ ফ্যাক্ট আন্‌সেট্‌ল্‌ড্‌ করে দিলে হে তোমাদের সুরেন ব্যানার্জি। জানুয়ারী থেকে আসাম, বাংলা, বেহার, ওড়িষ্যা, আলাদা আলাদা প্রভিন্স হয়ে যাবে। লর্ড কারমাইকেল আস্‌বেন বাংলার প্রথম গভর্ণর হয়ে। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি আমরা—ভারী ভালো লোক। খাঁটি মানুষ।

ওপরওলার সামনে বাগচি বাক্‌বিস্তার করেন না, কিন্তু হরেন মুখফোঁড় মানুষ। বলেন,—সার্‌, ভালো খবরটা খালি দেশসংক্রান্ত,—না—

—ক্লেভার, ভেরী ক্লেভার। না শুধু দেশ সংক্রান্ত নয়। জানুয়ারী থেকে বাগচি মহকুমা হাকিম হয়ে যাবে উত্তর বাংলার নিশ্চিন্তপুরে। দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি জায়গা। স্বাস্থ্যকর নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা।

হরির লুটের বাতাসার মতো ভালো খবরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হ্যাসেট উঠে দাঁড়ান। বাগচিকে বলেন,—ওয়েল, ওয়েল, মাই সন, আই হ্যাভ্‌ ডান মাই বেস্ট। মেয়ে কোথায়? কনখলকে বলেন—হ্যালো, ইয়ংম্যান, লীভ্‌ মি টু ইওর মাদার।

সাহেব উঠে যেতে হরেনবাবু বাগচির করমর্দন করে প্রায় নাচতে বাকি রাখেন। বিদ্যা-ভূষণ বলেন—অতি সজ্জন ব্যক্তি। এম্‌নি যদি সব ইংরেজ হোতো।

তার্কিক হরেন জো পান। বলেন,—হলে কি হোতো? এ জীবনে স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো না। শাসক শ্রেণী অবিবেচক ও অত্যাচারী না হলে বিদ্রুপ মত দানা বাঁধতে পেত না। ব্যক্তিগতভাবে হ্যাসেটকে দেবতুল্য মানুষ মনে করি—ইংরেজের প্রতিভূ হিসেবে কার্জন ফুলার কার্লাইল লায়নেরাই কাম্য—এই নির্বীর্য দেশে অন্তত কিছুটা প্রাণসঞ্চারের সমিধ জুগিয়েছে।

বাগচি বলেন—থামো হে। হ্যাসেট আস্‌ছেন।

হ্যাসেট এসেই হরেনকে বলেন,—যাচ্ছি আমি। আই সে হরেনবাবু, আপনি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সাক্ষী বিষয়ে যে পয়েণ্টটা সেদিন উল্লেখ করেছিলেন, যদিও সেটা এক্ষেত্রে পুরো প্রযোজ্য নয়, তবুও একেবারে উড়িয়ে দেবারও নয়। জাজ ইমার্সন আর কলকাতার কাউন্সিলর, তাঁরাও একমত। ঠিক্‌ ওই ধরনের ডমেস্টিক গসিপ-এর ওপর নির্ভর করে পিয়ারীর বিরুদ্ধে কেস্‌ দাঁড় করানো যায় না,—হি গোজ্‌ স্কটফ্রী। তবে ইন্‌স্যুরেন্সের টাকা কিছু পাবে না, কোম্পানীর লোক এন্‌কোয়ারী রিপোর্টে মেরে দিয়ে গিয়েছে।

এ সুসংবাদের সম্ভাবন আভাসে ইঙ্গিতে আগেও আলোচিত হয়েছে, তবুও খোদ ডেপুটি কমিশনারের জবানী খবরে প্রত্যেকেই হর্ষ প্রকাশ করেন। হ্যাসেট বাবার মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে থাকেন,—কিন্তু আই ডোণ্ট লাইক পিয়ারীস্‌ মেথড্‌স্‌। হি ইজ নট এ স্পেইট্‌ ফেলো। আমি বহুদিন এখানে আছি। শিলেটের সবায়েরই নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজখবর রাখি। দরগার হাজি, রেভারেণ্ড নিকলসন, পরেশবাবু, গীতা সোসাইটির স্বামীজি, এঁদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় আমি আপনাদের থেকে কম নই। কিন্তু বর্তমান সরকারী নীতিতে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটছে, সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমার কার্য-কলাপেও উনিশ বিশ হতে বাধ্য। আশা করি, আপনারা পারিক মেন, এটুকু বুঝবেন।

হরেনবাবু হাত কচ্‌লে বলেন,—রামরাজত্বে ছিলুম আমরা। আপনার সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সদয় ব্যবহার, প্রতি শিলেটবাসীর বুকে জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে চিরদিন। তা না হলে, স্যার্‌, আমি প্যারীবাবুর সবচেয়ে বিরোধী, আপনাকে গিয়ে তাঁর জন্যে ধরি?

—নো নো হরেনবাবু, ইউ আর আপরাইট, অনেস্ট টু দি কোর। লোকচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা কম নয় জানবেন। তবে এডুকেটেড বেঙ্গলের অ্যাটিচেশন—ইট্‌স্‌ ইন্‌ দি উইণ্ড। এ হাওয়ার তোড় ঝড়ে দাঁড়াবে কিনা, দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকব না। যাক্‌, ইট্‌স্‌ নাইদার হিয়ার, নর দেয়ার। অন্দরের দিকে তাকিয়ে নিভাননীকে উদ্দেশ করে বলেন,—নিভু-এর মতো একটি মেয়ে ছিল আমার। আর্মি অফিসারের সাথে বিয়ে হয়েছিল। নর্থওয়েস্টে একটা রাইজিংএ মোম্যাদ দসুর হাতে দু'জনেই প্রাণ দেয়। তাই তো রণছোড় সিং যেদিন বলেছিল কনখলকে স্যাণ্ডহার্স্টের জন্যে সুপারিশ করতে, আমার মন সায় দেয়নি।

মোটা বুরুশের মতো ভুরুর তলায় চোখ দুটো বোধ হয় ছলছল করে ওঠে। গলাও যেন ধরে আসে। কিন্তু সাহেবকা বাচ্চা—আধ মিনিটেই স্বাভাবিক হয়ে যান।

—ওয়েল নিভু, ওয়েল বাগচি—চলি এবার। জানুয়ারী থেকে নিজের এলাকায় গিয়ে রাজত্ব করবে আর কি! কিপ্‌ এ ক্লিয়ার হেড্‌—গুড্‌ বাই।

হারুণ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে। ঘোড়ায় উঠে ধীর কদমে হ্যাসেট বেরিয়ে যান। মেয়ে জামাইয়ের উল্লেখের সময় সাহেবের গলা ধরে আসা কারোরই নজর এড়ায় নি। বৈঠক আর জমে না। এতগুলো সুখবর তারিয়ে তারিয়ে চাখ্‌বার মনোভাবও যেন উবে যায়।

এক বোঝা গোঁফ ও কটা চামড়ার তলায় একটি অতি সাধারণ পিতার স্নেহপ্রবণ মনের কাতরতা সবায়েরই মর্মস্পর্শ করে। বাগচি ভাবপ্রবণ মানুষ—চশ্‌মা মুছবার অছিলায় চোখের ছলছলানি আড়াল করেন।

হঠাৎ প্যারীবাবুর বাড়ীর দিক থেকে কান্নার রোল ওঠে।

২৩

জীবনটাই নাটক। প্যারীবাবুর বিপন্মুক্তির খবর নিয়ে নিভাননী যখন ও বাড়ীর দিকে পা বাড়ান, তখনই কান্নার রোল ওঠে। বাইরে কর্তারা, আশে পাশের বাড়ীর লোকজন, সবাই যখন পৌঁছল, প্যারীবাবু তখন সমস্ত সুসংবাদ দুঃসংবাদের অতীত। তাঁর প্রাণহীন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। মাথার কাছে ছেলে জীবন আর পায়ের কাছে ঊষা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

জীবিত প্যারীবাবু যার কাছে যতো ধৈর্যবিদ্রূপের পাত্রই হোন্ না কেন, মৃত্যুর দৌত্য তাঁকে সাময়িক সমবেদনার যোগ্যতা অর্পণ করে। প্রাথমিক ফিস্‌ফাস্, জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তার ডাকতে যায় একজন। প্রকাশদেরও খবর দেওয়া হয়। প্রচারক পরেশবাবুর নির্দেশে নিভাননী ঊষাকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যান। হরেনবাবুর স্ত্রী নির্মলাও এসে যান। নির্বাক সান্ত্বনার স্পর্শ ছাড়া আর কি দেবারই বা আছে তাঁদের, ঊষারও অন্ধোরধারে কেঁদে বুক হালকা করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

মিনিট পনেরোর মধ্যে লোকের ভীড়ে বাড়ী ভর্তি হয়ে যায়। প্রমোদবাবু, সরকারী ছোট ডাক্তার, পরীক্ষা করে বলেন—পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন, তারই জের। আক্রমণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে হার্টফেল করেছে।

শেষকৃত্যের সামাজিক ফৌজ যেন প্রস্তুতই থাকে। প্রকাশ তাদের দলপতি। পারিবারিক পুরুতঠাকুরের আগমন হয়। যথাচার মাল্যচন্দনাদি সেরে-সুরে তিনি বিদায় নেন। মহিলারা ছাড়া ও বাড়ীতে কেউ আর থাকেন না। বাগচির বারান্দার বৈঠক সেদিন আবার বসে। কিন্তু হাস্যপরিহাস আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে না। সবায়ের মনে একটা যেন থমথমে ভাব। আকস্মিক মৃত্যুর আবির্ভাব আজ প্যারীবাবুকে যেন শ্লেষ বাঙ্গের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়—বাগচির মনে কবেকার পড়া কবিতার কথাগুলো উঁকিঝুঁকি দেয়, মৃত্যুর প্রসঙ্গে,—

'তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে;
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?'

বাগচির মনে হয় দিল্লীর দরবারে হাজিরা দেবার উমেদারী করবার একটি লোকের অভাব ঘটল। ঠকিয়ে ইনসুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় করবারও। এখন যেখানে লোকটিকে হাজিরা দিতে হবে সেখানে ঠকবাজী চলবে কিনা জানা নেই বাগচির। প্যারী-চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলো মনে আসায় দুঃখিত হন বাগচি। মানুষ নিছক শয়তানও নয়, নিষ্কলুষ দেবতাও নয়। ভাবতে চেষ্টা করেন সদামৃতের মধ্যে কোনো প্রশংসনীয় দিক ছিল কিনা।

ছেলের দল, মানে অমৃত, ব্যাঙা, কনখল, গেটের ধারে কামিনীফুলের গাছতলায় বসে জটলা করে। রাস্তার ও-পাশের বাড়ী থেকে বিদ্যাভূষণের ছেলে অমূল্য এসে পাশে বসে। অমূল্য যদিও প্রকাশের দলের একজন বড় তল্‌পিদার, কিন্তু বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের শ্মশানযাত্রায় যোগ দেয়নি। নিজস্ব মতামত কিছু গড়ে উঠতে পায়নি, বাবা পছন্দ করবেন না, তাই। তা না হলে অমূল্যর নিজের যাবার ইচ্ছে ছিল। সমাজ-শাসনের ফাঁস কেটে তরুণ মনগুলো উড়ি উড়ি করতে সুরু করেছে, কিন্তু ব্যাধের সজাগ পাহারা এড়ানো দুঃসাধ্য।

স্বজনবিয়োগ বিষয়ে ওদের মধ্যে ব্যাঙা ওয়াকিবহাল। কিছুদিন আগেই ওর বাবা মারা গিয়েছে। যদিও হাসপাতালে, তবুও মায়ে ছেলেতে অনেক কেঁদেছে ওরা। ওই নতুন মাসী সেদিন ব্যাঙার চোখের জল মুছিয়েছেন, জটিলাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মনে পড়তে ব্যাঙা দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে। অন্য ছেলেরা বোকার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিমর্ষ-ভাবে বসে থাকে। শুধু অমৃত একটু করিৎকর্মা, কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলে,—প্যারীবাবু এবার কোথায় যাবে রে, স্বর্গে, না নরকে?

সদ্য সদ্য মৃত্যুর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো অকরুণ মনে হয় কনখলের। গালগল্পের যমরাজা দূত পাঠিয়ে মানুষের আত্মাকে নিয়ে যান। বৈতরণী নদী পার হয়ে দুটো দরওয়াজা। একটা স্বর্গের, একটা নরকের। বেঁচে থাকার সময় যে যেমন ভালো মন্দ কাজ করে তারই বিচার করে খুলে দেওয়া হয় একটা দরওয়াজা। প্যারীবাবুর ভাগ্যে নিশ্চয়,—নাঃ। ভাবনা ভুলতে চায় কনখল। বলে,—তোর বাবা ত বাঁর ছিল, নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে ডাক্তার সাহেবের মেম আর বাচ্চাদুটোকে বাঁচাতে গিয়েছিল, আমাকে ত বাঁচিয়েই ছিল—তোর বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে।

ব্যাঙা ধরা গলায় বলে, কিন্তু বাবা যে চুরি করত। চুরিকরা ত পাপ,—

—পাপ না ছাই। কাজকর্ম না থাকলে, ঘরে কিছু খাবার না থাকলে চুরি করায় পাপ হয় না। হরেন কাকাদের সাথে বাবা একদিন গল্প করছিলেন, শুনেছি।

অমূল্য গীতা সোসাইটির পাণ্ডা। বাংলায় গীতার ব্যাখ্যা অনেক শুনেছে। বলে,—ঠিকই ত। মানুষ মারা ত পাপ?—কিন্তু কেষ্টঠাকুর অর্জুনকে মানুষ মারতে বলেছেন, অবিশ্যি ধর্মযুদ্ধে। প্রাণ বাঁচানো ত ধর্ম, তাইলে খিদের সাথে যুদ্ধও ধর্মযুদ্ধ। ব্যাঙার বাবা কিচ্ছু পাপ করেনি।

ব্যাঙার বাবার স্বর্গবাস সম্বন্ধে অতঃপর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না। প্যারী-বাবুর বর্তমান আবাস সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকে ছেলেরা। অপাপবিদ্ধ মনের সহজাত সৌজন্যবোধ কটুচিন্তা নিবারণে সাহায্য করে।

খিড়কির পাশ দিয়ে নিভাননীকে বাড়ী ফিরতে দেখা যায়। ব্যাঙা আর কনখল বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। অমৃত অমূল্যও উঠে পড়ে। বারান্দায় বড়দের বৈঠক তখনো চলে। প্রচারক পরেশবাবু, আর জাফর ডাক্তারও এসে গেছেন। আয়োষা, বা তার মা, আসেননি। হুট্ করে আয়েষা আজকাল আর কোথাও যাওয়া আসা করে না। বিবি রোজমেরীর স্কুলে যাওয়া শুধু আব্বাসের আগ্রহে বজায় আছে। ইংরেজী চালে ঘরকন্না চালানো আর সমাজে চলা-ফেরার কায়দা কানুন শেখাচ্ছেন ফ্লোরেন্সবিবি, পাদ্রী নিকলসনের প্রৌঢ়া কুমারী বোন। গিন্নিবান্নি অথবা বয়স্কা সহচরী ছাড়া অনাত্মীয়সমাজে আত্মপ্রকাশ নিষিদ্ধ। সাহেব-মেমেরা পদে পদে বাধানিষেধের ধমক থেকে মুক্ত, এই মনে হত কনখলের। কিন্তু ওরে বাবা, পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা নৌকোর পালের মতো ফাঁপা ঘাগরা, পুরো হাত আস্তিনফুলো

আঙরাখা, আর বালিশের কুঁচি দেওয়া থুত্‌নীবাঁধা টুপী পরা ফ্লোরেন্সাবিবি যেন একটি মূর্তিমতী হৃৎকম্প। হ্যাসেটের মতো ভারিক্কী সাহেবের একটুও বেচাল হবার সাহস নেই তাঁর সামনে। তার ওপর চোখ দুটো ইঁদুরের চোখের মতো পিট্‌পিটে, ওপর ঠোঁটে পরিষ্কার গোঁফের রেখা। কনখলের মনে হয়, গাঁয়ের সেই রেফের মতো টিকিওয়ালা বিটলে বটুক পণ্ডিত কোথায় লাগে এর কাছে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখে দুজনের মতো বিছানা পাতা হয়েছে। মায়ের বালিশ চিনতে দেরী হয় না। মনে মনে খুশী হলেও মুখে বলতে চায় না কনখল। গিয়ে মাকে বলে,—এর দরকার কি ছিল মা, আমি কি একা শুতে ভয় পাই?

—ভয় কিসের? কনখল ত মস্ত বীর। যদি আমিই ভয় পাই, তাই আগেভাগে একজন বীরপুরুষের কাছে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বলে হাসেন নিভাননী।

মুখের মতো জবাব জোগায় না কনখলের। একটু থতমত খেয়ে বলে—আচ্ছা, মা, প্রকাশদারা ত চাদর মুড়ি দিয়ে জীবনের বাবাকে নিয়ে গেল। তারপর কি করবে?

—নদীর ঘাটে নিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

—একটা মানুষকে পোড়াবে?

—প্রাণ থাকা পর্যন্ত মানুষ, এখন ত ওটা শুধু দেহ, প্রাণহীন দেহ। দেখিসনি, ওই বাদামগাছটা যখন ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেল, ওটাকে কাটিয়ে কুটিয়ে আমরা জ্বালানীকাঠ করলাম। ওটা ত আর গাছ রইল না,—যতক্ষণ শিকড় দিয়ে মাটির রস টানতো, ফুল ফোটাতো, ফল ফলাতো, ততদিন ওটা জীবন্ত একটা গাছ ছিল। কিন্তু ভেঙে পড়ে শুধু কাঠ হয়ে গেল।

তত্ত্বকথা বোঝে না কনখল। কিন্তু উপমার উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারে। মানে বোঝার থেকে তুলনার ইঙ্গিত সহজে প্রবেশ করে শিশুমনে। কিন্তু মনের গোপন কুঠুরীতে একটি তার্কিকও বাস করে। সময়ে অসময়ে সেও মাথা চাড়া দিতে চায়।

—তা যেন হোলো। তবে সাহেবরা আর মুসলমানেরা না পুড়িয়ে কবর দেয় কেন কেউ মরে গেলে?

এইবার জবাব না জোগানোর পালা নিভাননীর। কিন্তু শিশুমনের কৌতূহল সাধ্যমত মেটানো উচিত। তিনি বলেন,—তোরা ত ভূগোল পড়েছিস। এই পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ মাটি। হিন্দুরা নিষ্প্রাণ দেহ পুড়িয়ে, ছাই করে, নদীর জলে মিশিয়ে দেয়। যারা হিন্দু নয়, তারাও ফেরৎ দেয় মৃতদেহ পৃথিবীকে—তবে জলে নয়, মাটিতে পুঁতে। ঐ যে মরা গাছের কথা বলেছি—যদি আমাদের মতো কেটে কুটে ঘরে তোলবার কেউ না থাকত, তবে ও গাছটাও একদিন মাটিতে মিশে যেত। এই পৃথিবীতে যাদের সৃষ্টি, তারা বেঁচে থেকেও পৃথিবীর, মরে গিয়েও পৃথিবীর।

এ সব কথা দুর্বোধ্য হয়ে আসছে কনখলের পক্ষে, বোঝেন নিভাননী। কিন্তু নিজের চিন্তাধারার খেই ছাড়তে পারেন না। বলে চলেন, পৃথিবীতে যারা জন্মে,—সব রকমের মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছপালা,—সবাই সবায়ের ভালোর জন্যে বেঁচে থাকে। নিজের প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে, পৃথিবীকে সুন্দর করে রাখে। প্রাণ শেষ হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে যায়—এক হয়ে যায় জল মাটি রোদ হাওয়ার সাথে।

কনখল এত কথার তাৎপর্য বোঝে না। আভাসে শুধু বোঝে, বেঁচে থাকার সাফল্য শুধু প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করা। কিন্তু ঘুম পায় যে। বলে, —মা, খেতে দেবে না?

নিভাননীর সম্বিৎ ফেরে। বলেন,—তাই তো—তোর সাথে গল্প করতে গিয়ে কত রাত হয়ে গেল দ্যাখ্। বাইরের বৈঠক ত এখুনি ভাঙবে বলে মনে হয় না। বাবার খেতে আজ দেরী হবে। চল্, তুই আর ব্যাঙা খেয়ে নিবি চল্।

ব্যাঙা, বাপ মরা অবধি এ বাড়ীতেই থাকে। তাকে ডাক দিয়ে, কনখলের হাতধরে নিভাননী, রহমতের রসুইখানার দিকে এগোন।

জয়ন্তী পাহাড়ের হিমেল হাওয়ার হিল্লোল সে রাত্রে সমস্ত শিলেট সহরকে অনড়, অবশ করে রইতে থাকে। শুধু লেপের তপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনের মধ্যে একটি ছোট্ট মন স্বপ্নরাজ্যে জাগে। পৃথিবী তো নিজেই কতো সুন্দর, ভাবে সেই মন। তবে কি তাকে আরো সুন্দর, অনেক সুন্দর করতে হবে, প্রাণ দিয়ে, দান দিয়ে, কাজ দিয়ে? বেঁচে থাকলে তাই-ই করতে হবে। আর মরে গেলে? আবার পৃথিবীর বুকেই ফিরে যেতে হবে। যেন একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান পেয়ে মন আশ্বস্ত হয়। স্বপ্নরাজ্যে যে সব ঘুমপাড়ানীরা থাকে, তারাই ভার নেয় ছোট্ট মনটাকে ঘুমপাড়াবার। অসাড়ে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করে কনখল; তারপর এক সময় ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

সকালে ঘুম ভেঙে মা'কে দেখতে পায়না কনখল। অনভ্যস্ত ঠেকে না, মা ত রোজ শোয় না তার পাশে। তড়াক করে উঠে জুতোজামা পরতে পরতে রাত্রের কথা মনে হয়। মা নিশ্চয় নতুন মাসীর ওখানে গেছেন। কনখল ঘর-বারান্দায় গিয়ে ব্যাঙাকে উঠিয়ে দেয়, বলে—আস্তাবলে আয়।

কি কুয়াশা! রাতের অন্ধকারের বাসিন্দা হিমেরা যেন আসন্ন সূর্যোদয়ের আশঙ্কায় পালাই পালাই করছে, কিন্তু তাদের ঘন ধূম্রনিশ্বাস তখনো চারদিক অস্বচ্ছ আবরণে ঘিরে রেখেছে। একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। ওদের গোল্লাছুট খেলার মাঠ যেন একটা ছোটখাটো দীঘি; দুটো একটা লম্বা গাছের ডগা, একটা বকফুলের আর একটা তেজপাতার—মাথা জাগাচ্ছে অথই গাঙে অদৃশ্য নৌকোর মাস্তুলের শীষের মতো। চেনা পথে আস্তাবলে পৌঁছে যায় কনখল। হারুণ আগেই এসে গেছে। কাঞ্চন লেজের বালাম দুলিয়ে ঘাড় কাৎ করে যেন চোখ ঠারে, তারপর ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসি হাসি মুখে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে সুপ্রভাত জানায়।

ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যায়। পুবের দূর বড়ো জঙ্গলটার দৈত্যের মতো বিরাট প্রহরী গাছগুলোর পেছন থেকে টক্‌টকে লালমুখো দুষ্টু ছেলে সূর্যের উঁকি জেগে ওঠে। কি চট্‌পটে ঐ সূর্যটা! উঁকি দিতে না দিতেই গাছের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে একলাফে এগিয়ে যায়। কিন্তু নির্মেঘ নীল আকাশের বিস্তারে পা দিয়ে গতিবেগ শ্লথ করে। যেন দুষ্টু ছেলের মতোই মজা করে বলতে চায়,—আর ধরাবি আমায়? ধর না।

পরাস্ত পৃথিবী পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মাখে না। সদ্য নিদ্রোত্থিতের সুপ্রসন্ন নেত্রোন্মীলনে সকৌতুকে নবজাত আলোক শিশুর দিকে চেয়ে থাকে।

কাঞ্চনের দলাইমলাই শেষ হওয়া পর্যন্ত আজ আর অপেক্ষা করে না কনখল। ব্যাঙা আসতেই বলে,—চল, বেড়িয়ে আসি। দু'জনে রওনা দেয় শাহজলালের দর্গা মুখো। রাস্তা নিরালা। এক আধটা বাংলো বাড়ী অনেকটা ঘেরাও জমির মধ্যে জবুথুবু বুড়োর মতো পিঠ কুঁজো করে উবু হয়ে বসে। কোনো কোনো বাড়ীর হাতায় সবে মরসুমী ফুলের প্রথম স্তবক ফুটতে সুরু করেছে। রসুই ঘরের চোঙা দিয়ে উনুনের ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে কোথাও। আঁতাঘরের ময়দানে নিকারবোকার পরা বুড়ো এণ্টনী সাহেব বিরাটকায় এক

কুকুরের রাশ ধরে বেঁকে পড়ে ছুটছেন। ওঁর নাতনী জুলিবাবাও আর একটা মাঝারী-গোছের সাদার ওপর কালো ফুট্‌ফুট্‌ ছাপ দেওয়া কুকুরের সাথে খেলছে একটা লাল বল ছুঁড়ে দিয়ে দিয়ে। কনখল শুনেছে বুড়োর কুকুরটা ষ্টেট ডেন, আর জুলিরটা ডালমেশিয়ান। কুকুর দেখতে ওর বেশ লাগে, কিন্তু পুষবার আগ্রহ এখনো মনে জাগেনি।

দূরে থেকে দর্গার মিনার চোখে পড়ে, কিন্তু কনখল জানে এখনো অনেকটা রাস্তা। আজকের বেড়াতে বেরোনো অনির্দেশ লক্ষ্যে। কালকের মৃত্যুর কালো ছায়া ওর মনকে আদৌ অভিভূত করেনি। মা'র সঙ্গে কথা বলে মন আরো পাৎলা হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর শোকের দিক মনে একেবারে রেখাপাত করেনি, তা নয়। নতুন মাসীকে কাঁদতে দেখেছে, জীবনকে কাঁদতে দেখেছে, পাড়ার গিন্নী-বান্নির, এমন-কি মা'র পর্যন্ত চোখে জল দেখেছে। একজন ছিল, সে নেই, এতে কষ্ট কার না হয়? কিন্তু প্যারীবাবু বেঁচে থাকতেও ওদের কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিলেন না, মরে গিয়েও অভাববোধের তীব্রতা সঞ্চার করে যাননি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথে প্রথম পরিচয় যেন অকরুণ অপরিচয়ের ছদ্মবেশে, দেখা দিয়ে গেল। জাগ্রত-জীবনের বিজয় অভিযানের মন্ত্র কানে দিয়েছেন নিভাননী, শিশুসত্ত্বায় সেই বোধ কাজ করে।

হঠাৎ ব্যাঙা চেঁচিয়ে ওঠে—দ্যাখ দ্যাখ—ছাগলটার বাচ্চা হচ্ছে। কিন্তু ও কি-রে, খুব কষ্ট পাচ্ছে যে।

বাচ্চা অর্ধেক বেরিয়েছে, কিন্তু পুরো বেরিয়ে আসছে না। ছাগল ঘাড় বেঁকিয়ে আধ-বেরোনো বাচ্চাটাকে যেন চাটবার চেষ্টা করছে।

কনখল এ দৃশ্য আগে দেখেনি। ও ভয় পেয়ে যায়। বলে—তবে কি হবে ভাই, বাচ্চাটা কি মরে যাবে?

ব্যাঙা বলে,—দাঁড়া, দেখি। একলাফে ব্যাঙা গিয়ে কোল পেতে বসে বাচ্চার দিকে। ছাগলের পেটে পিঠে হাত বুলোয়। খানিক পরে সুন্দর নখর একটি ধবধবে ছাগলছানা ভূঁয়ে পা দিয়েই থরথর পায়ে নাচ্‌তে কুঁদতে চেষ্টা করে, কিন্তু পড়ে পড়ে যায়। মা-ছাগল বাচ্চার গা চেটে দেয়।

ব্যাঙার জামা কাপড়, গা হাত পা, স্রাবে রক্তে একাকার হয়ে যায়। কনখল বলে,—কি করবি এখন?

—কি আর করব, চল বাড়ী ফিরে যাই।

—ওই বাচ্চাকে একা একা রাস্তার ধারে ফেলে?

—আরে, ওর মা'ই ত রয়েছে। মা থাকতে বাচ্চা কখনো একা হয়?

দু'জনায় বাড়ীর দিকে ফেরে। এবারে হনহন করে চলে। ব্যাঙাকে গিয়ে চট্‌করে ছাপছন্দ হতে হবে। ও-পাশের পেঁপে গাছওয়ালা বাড়ীর দাওয়ায় এক বুড়োকর্তা কলকেয় ফুঁ লাগাচ্ছিলেন, তিনি আপন মনে বিড়বিড় করেন—ভাবার্থ তার এই যে এ সব চ্যাংড়া লজ্জা-হায়ার মাথা খেয়েছে—এই বয়সে প্রসবের মতো একটা দৃশ্য ও গোপনীয় ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছে, সমাজে শ্লীলতা ভব্যতা আর কিছু রইল না। অপরাধী দু'জন ততক্ষণ এ সব মন্তব্য শোনার পাল্লার বাইরে।

যেতে যেতে কনখল বলে—বাচ্চা হওয়া আগে কখনো দেখিনি ভাই। কিন্তু মা'টা কি কষ্ট পাচ্ছিল।

ব্যাঙা পোখ্‌পাখালী জীবজন্তুর জগতে বেড়ে ওঠা ছেলে—সৃষ্টি রহস্য নির্দোষভাবে সব জানা ওর। বলে,—আরে সবায়েরই বাচ্চা ঐ ভাবেই হয়, তাই বলে মা কি কষ্টের কথা

মনে রাখে? গরুর বাচ্চা হবার পর যাস্‌ ত বাচ্চার কাছে—অ্যায়সা শিং বাগিয়ে আসবে তেড়ে গরুটা—পালাতে পথ পাবি না।

ফিরতি পথে প্রচারক পরেশবাবুর সাথে দেখা হয়ে যায়। ব্যাঙার রক্তাক্ত পরিচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওঁর। পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা শুনে গম্ভীর হয়ে যান তিনি। প্রজনন ক্রিয়ার একাংশের সাথে অপরিণতবয়স্কের সাক্ষাৎ পরিচয় যেন তাঁর সমর্থন লাভ করে না। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পদচালনা করেন। ব্যাঙা বলে—দেখ্‌লি, বুড়ো কেমন গোমড়া মুখো হয়ে গেল সব শুনে? জানিস্‌, বড়োরা সব আড়াল করতে চায় আমাদের কাছ থেকে।

আড়াল করার কি আছে এতে, মাথায় ঢোকে না কনখলের। পরেশবাবুর স্বভাবসিদ্ধ উদারতার অভাব ওর চোখ এড়ায় না।

সব মা'দেরই ত বাচ্চা হয়—পাখী মা, পশু মা, এমন-কি মানুষ মা'দেরও। তা না হলে ও নিজে হল কি করে? কিন্তু ঐ যে ব্যাঙা বলল, একভাবেই সবাই হয়? তবে কি সেও—ধেৎ! কেমন কান্না কান্না পায় কনখলের। ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। রহস্য উন্মোচনের অনুসন্ধিৎসা থেকে মনকে সবলে নিবৃত্ত করতে চায়।

বাড়ী ফিরে ব্যাঙা চলে যায় পুকুরঘাটে। তার বিপর্যস্ত বেশবাস, ও গোপন পদ-বিন্যাস, খানা কামরার জানালা দিয়ে নিভাননীর চোখে পড়ে। কনখল এসে অভ্যস্ত চেয়ারে বসে। মা'র দিকে কেন যেন নিঃশব্দ সহজ চোখে তাকাতে পারে না। এ বৈলক্ষণ্যও নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কিন্তু কিছু বলেন না তিনি। নেহাৎ মামুলী পদ্ধতিমাফিক খাওয়া সেরে কনখল নিজের ঘরে চলে যায়। পড়ার বই খুলে বসে বটে, কিন্তু মন থেকে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নানা দুরধিগম্য রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায়।

বাঁধাধরা ছকে দিনমান কাটে। সন্ধ্যের পর মা'র কোলে মুখ গুঁজে মনোভার লাঘব করে কনখল। নিভাননী চকিত হন, হয়ত চিন্তিতও। কিন্তু কে যেন ভেতর থেকে তাঁকে উত্তাক্ত বা সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে নিবারণ করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছেলের মাথার চুলে আঙুল চালান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন,—সব জিনিস কি সব বয়সে শিখতে পারা যায়? দেখা যায়, হয়ত কিছু কিছু বোঝাও যায়, কিন্তু জানতে হলে বয়েস হওয়া চাই, বিদ্যেবুদ্ধি বাড়া চাই।

কোল থেকে মুখ তুলে কনখল টল্‌টলে চোখে হরিণবাচ্চার মতো মা'র মুখের দিকে তাকায়। মা তার দিকে চেয়ে নেই। আপন মনেই বলে যান নিভাননী—চোখকান মেলে চললে কত কি নতুন জিনিস চোখে পড়বে। কিছুটা জানা, খানিক আধজানা, আর অনেক অজানা। আমার কংখু আমার কাছে জানতে চাইলে আমি সব বুঝিয়ে দেব। যতটা বুদ্ধিতে বেড় খাবে, ততটা।

এর পর সমস্ত প্রসঙ্গটা লঘু করে হেসে বলেন—বাবা কি করে আপিসের কাজ করেন, বললে কি তুই বুঝতে পারবি? হরেনবাবু মামলা লড়েন আইনের জোরে, সে সব আইনকানুনের মার প্যাঁচ কি তোর মাথায় ঢুকবে? কলের গানে কত মানুষের গলার আওয়াজ শুনি আমরা, কি করে একখানা কালো চাক্‌তির ভেতর সে সব আটকা পড়ে আছে তার কৌশল কি ঝট্‌ করে বললেই বোঝা যাবে? কতো দেখতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, আর অনেক বড়ো হতে হবে—তবে তো! আচ্ছা, তুই এবার ইস্কুলের পড়াশুনা নিয়ে বোস্‌—আমি একবার নতুন মাসীর খবরদারি করে আসি।

নিজের ঘরে এসে খাতাপত্তর খুলে বসে কনখল। পড়াশুনায় মন বসে না। আকাশ-

পাতাল ভাবে—দানা বাঁধে না কোনো ভাবনা। মেঝেতে ব্যাঙা খোলা মোমবাতির সামনে বসে পড়ছে, ও পাশে রহমৎ আধভাঁজ করা কম্বলে বসে হাঁটুমুড়ি হয়ে ঝিমোচ্ছে। বাইরের বৈঠকের আলাপচারীর আওয়াজ কানে আসে—শুধু অর্থহীন শব্দ। মন চায় না সে সব কথার মানের পেছনে ছুটতে। কালকের মরণ, আর আজকের একটা জন্ম, মনের ভারসাম্যে দোলা দিয়ে গেছে, মন দুলছে বারান্দার দেয়ালঘড়ির ঝুলেনচান্তির মতো এদিক ওদিক, তাকে স্ববশে এনে স্থির করতে পারে না কনখল। ছেঁড়াছেঁড়া টুকরো ছবির মতো কত কি দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। ক্লান্ত মাথা হাতে ভর দিয়ে চোখ বোজে কনখল, সদ্যজাত ছানাটার যখন গা চাটছিল ছাগলটা—কী নিবিড় স্নেহে তার চোখ দুটো অর্ধ-স্তিমিত হয়ে আসছিল, শুধু সেই ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে ভেসে ওঠে।

২৪

জিজ্ঞাসা একটা ঘূর্ণির মতো। কী, কেন, তবে, তাহলে? একটার পর একটা পাক খেয়ে ঘোরে মনের মধ্যে; সে আবর্তের যেন কোনো শেষ নেই। অন্তর্লোকে জেগে উঠছে, আর এক কনখল, যে কেবল জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে পড়ছে। বাইরের কনখল আগের মতোই হাসে, খেলে, খায়-দায়, স্কুলে যায়, কিন্তু থেকে থেকে অন্তর্মুখী হওয়ার বিড়ম্বনা এড়াতে পারে না। এই সদ্য উন্মেষোন্মুখ স্বৈতসত্তার ঘাতপ্রতিঘাত নিভাননীর সজাগ চোখ এড়ায় না, যতক্ষণ কাছে থাকে, ব্যাকুল অভিনিবেশে ঘিরে রাখেন ওকে। মনকে চিরাচরিত সংস্কার থেকে মুক্ত করতে চান, ছেলের মনে যে আর একটা মানুষ জাগ্‌ছে তাকে শাসন বন্ধনহীন মুক্ত হাওয়া-বাতাসে বিচরণ করতে দিতে চান। খাওয়া-শোওয়া বেশ-ভূষার কড়াকড়ি শিথিল করেন না আদৌ, কিন্তু শেখবার, জানবার কৌতূহল অবারিত হাতে মেটাতে চান।

ধোঁকা লাগে। সব কি ঐটুকু ছেলেকে খোলাখুলি বলা যায়? তাই যখন কনখল ওঁকে শুধোয়—আচ্ছা মা, শুধু মা'দেরই বাচ্চা হয়, বাবাদের হয় না কেন? হক্‌চকিয়ে যান নিভাননী। আঁচে বোঝেন, সেই সেদিনকার ছাগলছানার জন্মকথা ছেলেমহলে অনালোচিত থাকেনি। নানান বয়সের, নানান ঘরের ছেলেরা একসাথে ঘোরাফেরা করে। বয়স্ক কারো কাছে কিছু শুনেছে কনখল, কিন্তু বোঝেনি কিছুই। এ প্রশ্ন তার নিষ্পাপ সরল মনের অদম্য জ্ঞানপিপাসা মাত্র। ফুলের রেণুর উদাহরণ, মৌমাছি প্রজাপতির দৌত্য, এই সব মনোরম আখ্যায়িকা ফেঁদে তখনকার মতো প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যান ছেলের মন। কিন্তু বোঝেন, শক্ত পরীক্ষা সামনে। কোন্ দুর্ভেদ্য বর্মে এ দুর্বার প্রশ্নবাণ ব্যাহত করবেন ভেবে আকুল হন। বাগচি শিক্ষায় আহারে বিহারে বেশভূষায় সংস্কারমুক্ত, হয়ত কিছুটা বা মননেও। কিন্তু সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অপরিণতমস্তিষ্ক অপ্রাপ্ত-বয়স্কের সাথে রাজী হবেন কিনা, সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। আধুনিকতার তবকমোড়া বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে একটি সাবেকপন্থী নীতিবিদ বাস করে বাগচির অন্তরে, তার কাছে এ সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। নিভাননীর মনশ্চক্ষুতে দেবপ্রতিম হাজী সাহেবের জ্যোতির্ময় মুখ জাগে। তাঁর কাছেই পথনির্দেশ নেবেন তিনি, সেই সত্যসন্ধ ঋষিপ্রতিম জ্ঞানীর কাছ থেকে।

সান্ধ্যনামাজের পর যখন হাজী সাহেব একা পায়চারী করেন চবুতারার ধার দিয়ে

বাঁধানো রাস্তায়, নিভাননী এসে পৌঁছে যান। বাগচি আর কনখল জাফর ডাক্তারের বাড়ী গেছে, উনিও ফিরবেন সেখানে। আশীর্বাদ বর্ষণ করে হাজী সাহেব বলেন,—মা'কে উতলা দেখছি যেন? মন অশান্ত হয়েছে বুঝি?

শোনেন নিভাননীর সমস্যার কথা। কালেজী তকমা না থাকলেও তাঁর নিজা মা সুশিক্ষিতা, জানা ছিল তাঁর। যে প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনা করতে এসেছেন আজ, জানতে পেরে মনে মনে তারিফ করেন। যেন একজন সমবয়সী সতীর্থের সাথে কথা বলছেন, তেমনিভাবে বলেন,—বেশ ত, এ বিষয়ে কি জানতে চাও তুমি?

—যে বিষয় আমাদের দেশে পরমবন্ধুরাও নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করে না, মা হয়ে আমার ছোট ছেলের সাথে কি বলব আমি তার সম্বন্ধে, এইটুকু বুঝে উঠি না বাবা।

নীরবে পুরো এক চক্কর পাক দেন দু'জনায় চবুতারা ঘিরে। তারপর হাজী সাহেব যেন আপন মনেই বলে যান—মূল দোষ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির। বাড়ীর, স্কুলের, সঙ্গী-সাথীর। অনাবিল শিশুমনে প্রথম প্রবৃত্তি জাগে লোভ আর রাগ। থাবার চুরি, ফুল চুরি, ছবি চুরি নিজের অজান্‌তে করে বসে ছেলেরা। শাস্তি পায়, শিক্ষা পায় না। রাগারাগি মারামারিও ঐ এক ফল। মনের সাহচর্য দিতে কেউ এগিয়ে আসে না। না বাপ-মা, না গুরুমশায়েরা। শাস্তিতে ত শুধু ভেতরে ভেতরে জেদ জমে ওঠে। একটু অনবধান হলেই আবার বিদ্যুতির রাস্তায় পা বাড়ায়। বানের জল যেমন বালির বাঁধ মানে না। তোমার আজকের বিষয় কিন্তু শিশুর বেলায় কোন কুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত নয়। নিছক কৌতূহল। গোপন আড়ালের সাথে প্রথম পরিচয়ের দ্বিধা-ভয়-আগ্রহ মেশা। বয়স বাড়ার সাথে এ জিজ্ঞাসা প্রবল প্রবৃত্তির রূপ নেবে, যদি না এখন থেকে খোলা মনকে তরল করে দেওয়া যায়। সহজ সরল ভাষায় ওকে খুলে বলতে হবে প্রশ্নের উত্তর—মায়ের আবেগ ভালোবাসা মিশিয়ে নয়, অনাসক্তীয় অথচ মঙ্গলকামী গুরুর মতো। পারবে?

—কিন্তু—

—বলছি। শক্ত হতে হবে নিজেকে। দৃশ্য জিনিসের কোনো সহজাত আকর্ষণ নেই শিশুমনে। অজ্ঞতায় তার উদ্ভব, পারিপার্শ্বিকে বৃদ্ধি। কুশিক্ষা আর মূঢ় বাধা তাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় মাত্র। জ্ঞানবিজ্ঞানের আর পাঁচটা কথার মতো স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে হবে। বয়স যত বাড়বে, পরিচয়ের বিস্তারও বাড়বে। কুৎসিত ইঙ্গিতের কিম্বা অশ্লীল দৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য হবে না কোনো দিন। কিন্তু আজকের নির্ভীক শিক্ষা সেদিন বাঁচাবে ওকে সমস্ত কলুষ বোধ থেকে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিভাননী বলেন,—তাই হবে বাবা। আমার যতটুকু সাধ্য, চেষ্টা করব।

—শুধু চেষ্টা নয়, তুমি সফল হবে। মা, আমি সংসারবিরাগী দেওয়ানা মানুষ। কিন্তু আমি দেখেছি, আশ্চর্য মানুষের মনের পরিণতির ক্রমগুলো। বাল্যে, কৈশোরারম্ভে,—স্বচ্ছ, অনাবিল থাকে মন শীর্ণ ঝরণাধারার জলের মতো। কৈশোর শেষে, যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে প্রবৃত্তির তাড়না অন্ধ করে চৈতন্যকে—ফেনিল কদর্যোচ্ছ্বাসে সব পঙ্কিল করে দেয়। আবার বার্ধক্যে, কতো ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহমিলন, কান্নাহাসির অভিজ্ঞতায় থিতিয়ে পড়া পলির ওপর জাগে শান্ত, স্থির, কাকচক্ষু জলরাশি। মন তখন নিস্তরঙ্গ গভীর সমুদ্র। কিন্তু জেনো, অগণিত মানুষের অগণন চিন্তাধারা অগণন কর্মপদ্ধতি। প্রতি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ অগণনরূপে। নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে নিজের কাজ করে

যাবে, ছেলেও দেখবে নিজের বুদ্ধি, বিচার, স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠবে। নিজেকে চাপাবে না তার ওপর। তোমার ছাঁচে, কি আর কারুরও ছাঁচে তাকে গড়তে চেষ্টা কোরো না, তাকে তার নিজের মতো নিজে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে মাত্র। যে চারাগাছ প্রাচীরের আড়ালে মাথা জাগাচ্ছে, তুমি আড়াল সরিয়ে আলো বাতাস আসবার রাস্তা করে দেবে, মমতা দিয়ে জমিকে সরস করে রাখবে, শিশুচারা আপনা থেকেই বিশাল গাছে পরিণত হবার পথে পা বাড়াবে।

এত দমে এত কথা বলে থামেন হাজী সাহেব। নিভাননীরও বুকের ভার অনেক পাতলা হয়ে যায়। বড়ো রাস্তার মোড়ে বাগচি ও কনখলের দ্রুত পদক্ষেপ নজরে পড়ে। এই দিকেই আসছেন ওঁরা।

হাজী সাহেব বলেন,—একটু আগেই মানুষের মনের ক্রমপরিণতির কথা বলেছি। ছোট ছেলের মন ঝরণাধারার মতো খরস্রোত—থেমে থাকবে না কিছুতেই। আজ এ কৌতূহল, কাল ও জিজ্ঞাসা, ছোটখাটো প্রতিবন্ধকের মতো মাথা জাগাবে। কিন্তু প্রবল জলস্রোতে সব ভেসে যাবে। চলাই তার জীবন, তার চলবার পথ সুগম করে রাখা হিতৈষীর কাজ। তোমার চেয়ে তোমার ছেলের বড় হিতৈষী আর কে আছে, বল?

বাগচিরা এসে পড়তে ওঁদের প্রসঙ্গ শেষ হয়। যথারীতি অভিবাদন আশীর্বাদের পর আর কিছুক্ষণ পাইচারী করে ওঁরা ঘরে এসে বসেন। হাজী সাহেবের নিজের ঘরের পাশের ঘরটায় নানাবিধ কাঁচের পাত্রে, নানা রকম শুকনো আর চিনিজমানো মেওয়ার সংগ্রহ আছে, জানা আছে কনখলের। ও উস্‌খুস্‌ করে। হাজী সাহেব যেন সর্বজ্ঞ। আভাসেই বুঝে নেন ওর মনের কথা। গম্ভীর গলায় হাঁক দেন—গোলাম রব্বানি,—

কুর্ণিস করে খাস বান্দা এগিয়ে আসতে কনখলকে তার হাতে সঁপে দিয়ে ইঙ্গিতে ইতিকর্তব্য বুঝিয়ে দেন। ওরা চলে যেতে নিভাননী হেসে বলেন,—আপনার সব দিকে নজর। হাজী সাহেব নীরবে হাসেন শুধু। বাগচিকে বলেন,—জাফরের বাড়ীর হাল কি দেখে এলে?

—লোকে জনে সরগরম। আয়েষার বিয়ের কথা পাকা হতে দেশদেশান্তর থেকে অনেক আত্মীয় কুটুম এসে গেছেন। পাত্তা পাওয়াই শক্ত। বিয়েতে খুব ধুমধাম হবে বলে মনে হয়।

—আহা, তা ত হবেই। জাফরের ঐ একমাত্র সন্তান, আর বরও পেয়েছে তেমনি। খাসা ছেলে আব্বাস সাহেব। বলে চোখ বোজেন হাজী সাহেব। অস্ফুট স্বরে উর্দু কি পারসীতে কি যেন আউড়ে যান, বোধ হয় আশীর্বাণী।

নিভাননী বলেন,—কংখের খুব একা একা লাগবে ও বিয়ে হয়ে চলে গেলে। দুটিতে খুব ভাব হয়েছিল কিনা। আয়েষার ত কনা-গত প্রাণ। সেই জলে ডোবার পর ও যা করেছিল, আমি মা হয়েও তা পারতাম না। আবার ঝগড়া-ঝাঁটিতেও দুজনে কেউ কারো কম নয়। এখন শ্বশুর ঘর যাবে, তার ওপর বদলীর কাজ, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

হাজী সাহেব বলেন—টান থাকলে দেখা হবেই। কিন্তু কবে, কখন—সে এখন কে বলবে। কনখল নিশ্চয় ভাবছে, আর পাঁচটা জিনিসের মতো বিয়েটাও একটা মজার খেলা। খেলার শেষে ওরা দুটিতে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাত সর্বত্র। তিনি যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

কনখল ফিরে আসে। আখরোট, খোবানী, জর্দা আলু, মনাক্কায় দু'পকেট ভর্তি। এসেই বলে—এই পকেটটায় সব আয়েষার জন্যে। জানো মা, ওপরের ঘরে কত যে ফল আছে, গুণে শেষ করা যায় না। তাও ত আমি আপেল এই একটা ছাড়া নিইনি। যা বড়ো বড়ো।

হাজী সাহেব হেসে বলেন—বেশ ত। আপেল তোমার মন টেনেছে। ভগবানের কাছে জোর প্রার্থনা লাগাও, দেখবে, দেবদূত গিয়ে বাড়ীতে অনেক রেখে এসেছে। আর কাঠের বাক্সে তুলোয় জড়ানো টস্‌টসে আঙুর।

কনখল পুলকিত হয়ে বলে,—তাহলে ত বেশ হয়। চোখ বুজে সত্যিই প্রার্থনা করে কনখল। হাজী সাহেবের কথা কখনো মিথ্যা হবে না। তারপর বলে—যাবে না মা ও বাড়ীতে? আয়েষাটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। নিজে গিয়ে দেখবে চল। ঘাগরা পেশোয়াজ পরে চোখে সুর্মা এঁকে বেগম সেজে বসে আছে ঘরের কোণায়। আমি গেলাম ত কেবল ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসে। আর ছোট বড় কত যে মেয়ে জুটেছে।

বিদায় নিয়ে বাগচিরা ওঠেন, আবার জাফর ভবনে যাবার অভিলাষী হয়ে। ভগবানের কাছে কনখলের ঐকান্তিক প্রার্থনা পূর্ণ করতে ঝুড়ি মাথায় গোলাম রব্বানী রওয়ানা দেয় চুপিসারে ভিন্‌রাস্তায়।

পুলিশ হাসপাতালের টিলায় পেঁছে নিভাননী সোজা যান অন্দরে। কুলসম এক-পাল ফুফু চাচী ভাবীর তম্বিরে ব্যস্ত। গিয়েই বলেন,—কি লো, মেয়ে-বিয়ের উল্লাসে আমাদের ভুলেই রইলি যে একেবারে!

—আর দিদি,—বাড়ী-ভর্তি আত্মীয়কুটুম, সময় পাই না একেবারে।

—তা সত্যি। মেয়ে কোথায় লো, সেও ত ডুমুরের ফুল হয়েছে আজকাল।

কুলসম নিভার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন— এঁরা আসবার পর মেয়ের কড়া আবরু। ঘর থেকে বেরোনো পর্যন্ত বারণ। ওই ফ্লোরেন্স বিবি যখন আসে, তখন খালি তার সাথে বাড়ীর পেছনে একটু বেড়াতে পায়। আমার চাচীশাশুড়ীর ভারী কড়া নজর। অসৈরন হবার জো-টি নেই। আর জানেন ত দিদি, এঁরা সব গাঁয়ের মানুষ, এঁদের কায়দা-কেতাই আলাদা।

নিভাননী বলেন,—তা আর জানিনে। দেখতিস্‌ যদি আমাকে পুজোর সময় গাঁয়ের বাড়ীতে। জামা সেমিজ নেই, একগলা ঘোমটা টেনে কেবল ফাইফরমাস খাটছি বড়-ভাজদের। তা, ঐ কটা দিনই ত, মানিয়ে নিয়েছি কোনো রকমে।

তা মানিয়ে নেওয়া নিভাননীর আসে বটে। যে আধ ঘণ্টা রইলেন ওবাড়ী, তার মধ্যে করিমের মার ঘর গেরস্তালীর খবর থেকে সুরু করে কুলসমের দূর সম্পর্কের ননদ মরিয়মের বে-আক্কেলে খসমের দুস্‌রা সাদীর হদিস্‌ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বার করে নিলেন। তালাক দিলে মরিয়মের বারদিগর নিকা বস্‌বার কোন তক্‌লিফ নেই, এ খবরও অজানা রইল না নিভাননীর। কিন্তু মরদ ভারী মৎলবী, তালাক দিতে নারাজ। মরিয়মের নিজের নামে ছাতকে একটা কমলা বাগানের আধেলা অংশ আছে, মোটা আয়ের সম্পত্তি।

জাফর সাহেবের বুড়ী নানীকে হামালদিস্তায় পান ছেঁচে দিয়ে, খাদিজা আর ফতিমা দুই বোনকে বিবিখোঁপা বেঁধে দিয়ে সব আগন্তুকের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে বাগচিরা যখন ওঠেন, তখন রাত হয়েছে। একপাল মেয়ের মধ্যে কনখল নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। একান্ত-সাথী আয়েষা যেন বেদখল হয়ে গিয়েছে মনে হয় ওর। ইচ্ছে থাকলেও তার কাছে ভেড়ে

না। পোলো ময়দানের ওপর টিলার ধারে একা একা ঘুরে বেড়ায়। রুদ্ধ অভিমানে ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে উদ্গত অশ্রু থামায়। মনের মধ্যে একটা বাতিল করে আরেকটা, অনেক প্রতিজ্ঞা বুদ্বুদের মতো ওঠে আর মেলায়। সব কটাই আয়েষাকে নিয়ে, কি করে ওকে জব্দ করা যায় সেই মতলবে। যখন বাড়ী ফেরবার ডাক আসে তখন পাকা-পাকি মনস্থির প্রায় হয়ে গেছে। আয়েষা এরপর যেচে কথা কইতে এলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে যেন শুনতেই পায়নি এই ভান করে। কিন্তু আড়াল থেকে চুপিসারে দেখতে হবে আয়েষারও ঠোঁট ফুলে উঠছে কিনা।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১২। আমেরিকা : উনিশ শতক

উনিশ শতকে আমেরিকার যুগল মহাদেশকে ইয়োরোপীয়রা বলত 'নূতন পৃথিবী।' বস্তুত এই নূতন পৃথিবী ছিল 'নূতন ইয়োরোপ'। ইয়োরোপের ভাগ্যান্বেষীরা এসে এখানে বনবাদাড় সাফ করে বসবাস করেছিল। ইয়োরোপের উপছে-পড়া মানুষ ও মনন ঘর বেঁধেছিল পশ্চিম গোলার্ধে। সমুদ্রের ওপার থেকে বীজ এসে পড়ল কুমারী মাটির বুকে। লক লক করে বেড়ে উঠল সবুজ তাজা একটি চারা গাছ।

শুধু রাষ্ট্রবলে নয়, চিন্তায়, মননায়, শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্যোগে পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যমণি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তার একটি খণ্ডরাজ্যের নাম ম্যাসাচুসেট্‌স্ যার বন্দর বস্টনে ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা এসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা-এর বাক্স তুলে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। আমেরিকা যেমন ছিল নূতন ইয়োরোপ, ম্যাসাচুসেট্‌স্ তেমন ছিল 'নূতন ইংল্যাণ্ড'—ইংল্যাণ্ডের বেয়াড়া ছেলেদের উপনিবেশ। জন্মদাত্রী মা'র চেয়ে পালিকা মা'র প্রতি টান তাদের বেশী—নূতন মাতৃভূমিতে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলল—আমেরিকার মুক্তি সনদে ঘোষণা করল মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের বুনিয়াদি নীতি।

আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভব হল নানাবিধ সমস্যার। যন্ত্রশিল্প ও ধন-তন্ত্রের বিকাশ যে সমাজবৈষম্যকে তুলে ধরল জেফারসনের উদার শাসন বিধিতে তার সমাধান পাওয়া গেল না। যুগ বদলাবার সাথে সাথে সাম্য ও স্বাধীনতার রাস্তা নূতন করে খুঁজে বার করতে হয়, পৈত্রিক সনদে তার সন্ধান করা বৃথা। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের অগ্রজ, ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের পথিকৃৎ। সে দেশের মনীষা গণতন্ত্রের শাঁস বাদ দিয়ে খোল নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে না।

নৈরাজ্যবাদী ভাবনায় ইয়োরোপের আগে আগে চলেছে আমেরিকা,—আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে ছোট্ট রাজ্য ম্যাসাচুসেট্‌স্—ওয়ারেন, থোরো ও টাকারের দেশ। ওয়ারেন প্রুদ'র পূর্বসূরী, থোরো টলস্টয়ের। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামের পথপ্রষ্টা টাকার—যার বাস্তব পরীক্ষা হয়েছে গান্ধীর হাতে। বাকুনিনের বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদও আমেরিকার জমিতে শিকড় গেড়েছে, যার রক্তের ফসল ফলেছিল শিকাগোর হেমার্কেটে। আর শ্রমিকদের সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ এখানে রূপ নিয়েছে আই. ডব্লিউ. ডব্লিউর মারফত। নৈরাজ্যবাদের সবকটি ধারাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তায় ও কর্মে প্রবহমান।

১৭৯৯ সালে বস্টনের নিকটে অতি সাধারণ ঘরে যোসিয়া ওয়ারেনের জন্ম হয়। শিক্ষাদীক্ষা যেটুকু হোল তা নিজের চেষ্টায়। বিশ বছর বয়সে তিনি তিনটি বিদ্যেয় পাকা হয়ে উঠলেন—যন্ত্রশিল্প, গানবাজনা ও বেনিয়াবৃত্তি। ছেলেবেলাটা কেমন বেতালা কেটেছে তা এ থেকে বোঝা যায়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডের সমাজবাদী শিল্প-পতি রবার্ট ওয়েনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়েন তখন নিউ হারমানিতে একটি কমিউনিস্ট উপনিবেশ গড়বার উদ্যোগ করছেন। ওয়ারেন তাঁর সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। উপনিবেশটি

বরবাদ হয়ে যাবার পর ওয়ারেন যৌথজীবন যাপনে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। মজুর কেমন করে তার পরিশ্রমের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এই ভাবনা তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। ধনতন্ত্র এসে কারিগরের সর্বনাশ করেছে, সেদিনকার স্বাধীন শিল্পী হয়েছে আজ বেতন-ভোগী মজুর। মুদ্রা রাষ্ট্রের একচেটিয়া, মূলধন ব্যাঙ্কের সিন্ধুকে; শ্রমের বাজারে চলেছে অবাধ প্রতিযোগিতা, আর পুঁজির ওপর অল্পকটি ভাগ্যবন্তের একচেটিয়া অধিকার। কাজেই শ্রমিক মরছে আর পুঁজিবাদী ফাঁপছে। হাতের কাজ আর মাথার কাজে আশমান জমিন ফারাক। যারা খেটে খায় তাদের সব দিক দিয়ে মরণ।

এ নিয়ে লেখা ও বক্তৃতা বহু হয়েছে। প্রতিকারের কাজ বড়-একটা হয়নি। ওয়ারেন রবার্ট ওয়েনের শিষ্য, কথার চেয়ে কাজ বোঝেন ভাল। ১৮২৬ সালে ওঁহিওর সিন্‌সিনাটিতে তিনি একটি কারখানা ও দোকান খুললেন—যেখানে সময়ের মাপে কাজের দাম স্থির হয়। দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবী আর আনাড়ি মজুর সকলের কাজের একদর। ইটখোলার মজুর যদি ডাক্তার ডাকে এবং ডাক্তার যদি এক ঘণ্টা রোগী দেখে তা হ'লে তার ফী হবে এক ঘণ্টা ইটখোলার কাজ। সিন্‌সিনাটির 'সময় ভাণ্ডার' এই নিয়মের ওপর দু বছর চলেছিল। এখানে কোন মুনাফা ধরা হত না। মাল পয়লা করতে যা খরচ তাই তার দাম, অবশিষ্ট কারিগরের শিক্ষার সময় ও ব্যয় তার মধ্যে ধর্তব্য। দোকান চালাবার খরচ বাবদ দামের ওপর শতকরা সাত হারে মাসুল ধরা হত। খরিদ্দার দোকানদারের যতখানি সময় নিত ঘড়ি ধরে সেই সময়টার দামও জিনিসের সঙ্গে যোগ করা হত। কারিগর ও মজুরকে দাম দেওয়া হত শ্রমনোটের মারফত, নগদ টাকায় নয়। অর্থাৎ ছুতোর পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে একটা টেবিল তৈরি করলে একটা পাঁচঘণ্টার নোট পেত। এই নোট দিয়ে সে 'সময় ভাণ্ডার' থেকে পাঁচঘণ্টার অনধিক দামের যে কোন জিনিস কিনতে পারত। শ্রমনোটের পরিকল্পনাটা অবশ্য রবার্ট ওয়েনের।

ওয়ারেন দুখানি পুস্তকে তাঁর চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করেন,—"ইকুইটেব্‌ল্ কমার্স" বা ন্যায্য লেনদেন ব্যবস্থা (১৮৪৬) এবং "দ্য সিভিলাইজেশন" বা খাঁটি সভ্যতা (১৮৬৩)। তিনি সমাজবাদের রাস্তায় যান নি। তাঁর রাস্তা ব্যক্তিসর্বস্ব নিঃশাসন সমাজের। ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধিকার দিয়ে কয়েকটি নিরাজ যথেসমাজও তিনি গড়েছিলেন—এগুলি বেশ কিছু-দিন টিকেও ছিল। অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হবে। ব্যক্তি হবে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্‌প্রভু—তার ওপর থাকবে শুধু নিজের কর্মফলের শাসন। অপকর্ম করলে তার ফল সে নিজেই ভুগবে, তা নিয়ে অপরের মাথাব্যথা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য তা বলে প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা প্রতিভার সৃষ্টির ওপর কেউ জবরদখল করে বসতে পারবে না। ওয়ারেন নিজে সুযোগ পেয়েও জমি কেনা-বেচায় লাভ করেন নি এবং নিজের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ওপর কোন স্বত্ব রাখেন নি।

ওয়ারেন ছিলেন যন্ত্রবিদ্ ও বেনিয়া, হেনরি ডেভিড থোরো ছিলেন ভাবুক, কবি। ১৮১৭ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর কংকর্ডে তাঁর জন্ম হয়। হার্ভার্ড থেকে পাস করে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন একটি স্কুলে মাস্টারি করেন তারপর রাস্তাঘাট তদারকের কাজ নেন। ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির রাজ্যের ওপর তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। আঠাশ বছর বয়সে তিনি লোকালয় ছেড়ে ওয়াল্‌ডেনের অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল পশু, পাখি, মাছ, রেড ইণ্ডিয়ান আর বই ও খাতাকলম। তখন যুক্ত-

রাষ্ট্রে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল। যে সরকারের আশ্রয়ে এই পাপপ্রথা টিকে আছে থোরো পণ করলেন তাকে খাজনা দেবেন না। খাজনা না-দেবার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। একজন বন্ধু খবর পেয়ে তাঁর দেয় টাকা মিটিয়ে দিলেন, ফলে এক-রাত্রের বেশি তাঁকে জেল খাটতে হল না। দু বছর দু মাস অরণ্যবাসের পর তিনি ফিরে এসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। আইন-অমান্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ (রেসিস্‌ট্যান্স টু সিভিল গভর্নমেণ্ট, ১৮৪৯) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বনবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হল "ওয়াল্‌ডেন" বা আরণ্যক জীবন গ্রন্থে, ("ওয়াল্‌ডেন অর লাইফ ইন দি উড্‌স্"—১৮৫৪)।

অনেকের ধারণা থোরোর ধাত ছিল পলায়নপর। তাঁর নিশ্চল প্রকৃতিতে সভ্যতার উদ্দাম গতি সহ্য হত না বলেই তিনি বনবাস নিয়েছিলেন। আসলে থোরো খুঁজছিলেন জীবনের শ্রী ও ছন্দ। মানুষ ত' শুধু সামাজিক জীব নয়, সে প্রাকৃতিক জীবও বটে। ধনিক সভ্যতার দৌলতে মানুষ ও প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে কারখানার কাঁচা মাল। ওয়াল্‌ডেনে থাকতে থোরো নিজের রুটির ও আসবাব নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন, গম সীম ও আলুর চাষ করেছিলেন, জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে নিজে সেঁকে রুটি খেতেন। তাতে যে আনন্দ ও প্রাচুর্য তিনি ভোগ করেছেন তা নবাব বাদশার জোটে না। কায়িক শ্রম একটা কর্তব্য। এ শরীর সুস্থ রাখে, মন তাজা করে, মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে তার জীবনে ছন্দ ও মাধুর্য এনে দেয়। নিজের রুটি রোজগার করবার জন্যে দেহক্ষয় করে খাটবার দরকার হয় না। মাটি অত কৃপণ নয়।

> শুধু নিজের হাতের মেহনতে পাঁচ বছর আমি আমার প্রয়োজন মিটাইয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে বছরে ছয় সপ্তাহ খাটিলেই সব দরকারী খরচ চালানো যায়। সারা শীতকাল এবং গ্রীষ্মেরও অধিকাংশ সময় আমি পড়াশুনার জন্য পাইতাম।.....
>
> মোট কথা আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা হইতে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং একটা মজার খেলা—অবশ্য যদি সরলভাবে ও জ্ঞানীর মত বাঁচিতে হয়।..... কপালের ঘাম ফেলিয়া কাহারও জীবিকা সংগ্রহের আবশ্যক নাই, অবশ্য যদি না সে আমার অপেক্ষা অনায়াসে ঘর্মাক্ত হয়।[১]

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মাদ গতি জীবনকে নাশ করে দিল। পরিশ্রমী হলেই হল? পিঁপড়েরা কি কম পরিশ্রম করে? কিসের জন্যে পরিশ্রম তা দেখবার দরকার নেই?

এই যন্ত্রবদ্ধ সমাজে একদল নিষ্কর্মাকে পয়দা করেছে যারা 'জীবন্ত মানুষের গায় জোঁকের মত লেগে থেকে তার জীবনীশক্তি শুষে নেয়।' অপরাধ সৃষ্টি হচ্ছে এই ধন-বৈষম্য থেকে। ওয়াল্‌ডেনে এ-বালাই ছিল না। সেখানে থোরোর ঘরের দরজা দিনরাত খোলা থাকত। ঘর খোলা রেখে তিনি দিনের পর দিন বাইরে ঘুরে এসেছেন অথচ হোমারের একখণ্ড কাব্য ছাড়া আর কিছু তাঁর খোয়া যায় নি।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সকলে যদি আমি যেমন থাকিতাম সেইরূপ সরল-ভাবে বাস করে তাহা হইলে দেশে চুরি ডাকাতি থাকিবে না। এসব উপদ্রব

---

[১] কটাক্ষ বাইবেলের উক্তির প্রতি। ওয়াল্‌ডেন।

সেই সমাজেই শুধু থাকে যেখানে কেহ পায় প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশি, কেহ পায় কম। (ওয়াল্‌ডেন)

মানুষের নৈতিক শোধন শাস্ত্রশাসন দিয়ে হয় না। নীতিজ্ঞানের উৎস বিবেক। যখন অপরের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক শাসন স্বাভাবিক ন্যায়বোধের ওপর হাত দেয় তখন ব্যক্তিকে নিজের সততা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এই সুদৃঢ় প্রতীতিই 'পলায়নপর' দার্শনিককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে নামিয়েছিল এবং আইন-অমান্য প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধের রসদ জুগিয়েছিল। যে মানুষকে নিয়ে পশুর মত বেচাকেনা করে তাকে তিনি একটি পয়সা দেবেন না। ১৮৫১ সালে এন্টনী বার্নস্ নামে একজন পলাতক দাসকে ধরে এনে ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর সরকার মালিকের হাতে সমর্পণ করে। থোরো তখন একটি জনসভায় বলেছিলেন,

> ভাল সরকার জীবনকে অধিক মূল্যবান করে, মন্দ সরকার জীবনের মূল্য কমাইয়া দেয়। রেলপথ ইত্যাদি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সরঞ্জাম কিছুটা কমিলে তাহা বরদাস্ত হয় কারণ তাহা আমাদিগকে একটু সরলভাবে ও স্বল্পব্যয়ে থাকিতে বাধ্য করে মাত্র। আর যদি জীবনের মূল্যই কমিয়া যায়? মানুষ ও প্রকৃতির উপর দাবি আমরা কেমন করিয়া কমাইব, ন্যায়পরতায়, জীবনমূল্যে কেমন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিব?

আমেরিকান জাতি উৎসন্ন যাক সেও ভাল তবু যে সরকার দাসপ্রথার প্রশ্রয় দিচ্ছে আর মেক্‌সিকোর ভূমি দখল করবার জন্যে যুদ্ধ করছে তাকে যেন তারা মান্য না করে। হাজার হাজার লোক অন্তরে এর বিরোধী কিন্তু বাইরে নির্বিকার। সকল ক্ষেত্রেই যে অন্যায়কে বাধা দেওয়া সম্ভব তা অবশ্য নয়। 'অন্তত এটা দেখতে হবে যে কাজ আমি দুষণীয় মনে করি তা যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া না হয়।' সরকার যদি আমাকে দিয়ে তা করাতে চায় এবং না-পারলে আমাকে কারারুদ্ধ করে তাহলে কারাগারই আমার উপযুক্ত জায়গা। যিনি আমার হয়ে খাজনা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছেন তিনি কর্তব্যের ওপর হৃদয়ের জুলুম খাটিয়েছেন।

অনেকে যুক্তি দেখান যে অন্যায় দূর করতে হলে সংখ্যাগুরুর সমর্থন পাওয়া দরকার; জবরদস্তি বাধা দিতে গেলে অধিকতর অনর্থের সৃষ্টি হবে। তা যদি হয় ত দোষ সরকারের। সরকারই অধিকতর অনর্থের জন্যে দায়ী।

> কেন সরকার প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যায়ের সংশোধন করে না? কেন বিবেচনাসম্পন্ন সংখ্যালঘুকে সমর্থন করে না?.....কেনই বা সরকার সর্বদা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে, কোপার্নিকাস ও লুথারকে সমাজচ্যুত করে, ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে? (রেসিসটেন্স টু সিভিল গভর্নমেণ্ট)

যাঁরা সংখ্যাগুরুর ভোটে দাসপ্রথা রদ করাতে চাচ্ছেন তাঁরা বাস করছেন স্বপ্নরাজ্যে। যেদিন সংখ্যাগুরু স্বেচ্ছায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ভোট দেবে সেদিন রদ করবার মত কোন দাসপ্রথা অবশিষ্ট থাকবে না। ভোটের গুনতিতে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু যখন তারা সকল শক্তি নিয়ে বাধা দেয় তখন তাদের সামলানো সংখ্যাগুরুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

> সকল ন্যায়বান লোককে জেলে পুরিয়া রাখা কিংবা যুদ্ধ ও দাসপালন বর্জন

> করা এই দু'-এর মধ্যে একটি পথ বাছিয়া লইতে রাষ্ট্র কোন ইতস্তত করিবে না। এ বৎসর যদি এক সহস্র লোক খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তাহাতে হিংসা ও রক্তারক্তি হইবে না, বরং দিলেই রাষ্ট্রকে হিংসা ও রক্তপাতে সাহায্য করা হইবে।

এই প্রকার বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ। 'আর না হয় কিছু রক্ত পড়লই। যখন বিবেক আহত হয় তখন কি একরকম রক্তপাত হয় না?'

থোরোর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় যে কোথাও প্রতিরোধ শুরু হওয়া একান্ত দরকার—একজন অন্তত খাঁটি মানুষ এসে রুখে দাঁড়াক। থোরো পেয়েছিলেন মনের মত একজন লোক—যখন হার্পার্স ফেরিতে ক্যাপ্টেন জন ব্রাউন দাসপ্রথার প্রতিবাদে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন।[২] ১৮৫৯ সালে জন ব্রাউনের প্রাণদণ্ড হল। থোরো জনসভায় এসে শহীদের বন্দনা করলেন।

যে অপরের স্বাধীনতা হরণ করে তার নিজেরও স্বাধীনতা থাকে না। ঘোড়ার মুখে যে লাগাম লাগানো হল তার আর-এক মাথা সওয়ারের গলায় পাক দেয়। শাসন করা মানে স্বাধীনতা হরণ করা ও হারানো। থোরোর মূলমন্ত্র লাওৎসের মত, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল।' এ থেকে সিদ্ধান্ত হয়, 'যে সরকার আদৌ শাসন করে না সে সরকার সকলের শ্রেষ্ঠ।' কোন ভাল কাজ রাষ্ট্রকে দিয়ে হয় না। একটি মাত্র ভাল কাজ সে পারে,—তা হল কারও ব্যাপারে হাত না দেওয়া। রাষ্ট্র শ্রেয় বুদ্ধি ও সততায় নয়, শ্রেয় পশুবলে। বিবেককে নীচু হতে হবে পশুবলের কাছে?

> আমরা আগে মানুষ তার পরে প্রজা। সত্যের মর্যাদা রক্ষার অভ্যাস যতটা অভিপ্রেয় আইনের মর্যাদারক্ষার অভ্যাস ততটা নয়।

আইন ও ন্যায় এক নয়। আইন মানুষকে একটুও বেশী ন্যায়বান করেনি, বরং আইনের মান রাখতে গিয়ে বহু সৎ লোক অহরহ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছে। আইনের পাকে পড়ে মানুষ হয় যন্ত্র, ফৌজের সিপাইর মত বোধহীন বিবেকহীন কাঠের পুতুল, 'ক্ষমতাপন্ন নীতিহীন ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত চলমান দুর্গ ও অস্ত্রশালা'। যারা বিবেক দিয়ে রাষ্ট্রের সেবা করতে যায় তারা গণ্য হয় রাষ্ট্রের শত্রু বলে।

আইন এবং স্বাধীনতাও স্বন্দ্বাত্মক। আইন করে মুক্তি দেওয়া এক অদ্ভুত কল্পনা।

> আইন কদাপি মানুষকে মুক্তি দিবে না। মানুষকেই মুক্তি দিতে হইবে আইনকে। যখন সরকার নিয়ম ভঙ্গ করে তখন যাহারা নিয়ম রক্ষা করে তাহারাই নিয়মশৃঙ্খলার ধারক।.....যে সত্যকে বুঝিয়াছে সে পৃথিবীর প্রধানতম বিচারকের অপেক্ষা উচ্চস্থান হইতে তাহার হুকুমনামা লাভ করিয়াছে। সেই যথার্থ রায় দিবার অধিকারী, তাহার উপর পড়িয়াছে বিচারকের বিচারের ভার।

স্বৈরতন্ত্র, লোকনিষ্ঠ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই ধাপে ধাপে রাষ্ট্র ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতার দিকে। নিশ্চয়ই গণতন্ত্র এই অগ্রগতির শেষ ধাপ নয়। যতদিন না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে এক স্বাধীন ও উচ্চতর সত্তা বলে মনে করবে, যে সত্তা থেকে সে পেয়েছে তার

---

[২] ১৮৫০ সালে পলাতক দাসদের ধরে প্রভুর হাতে সমর্পণ করার আইন পাশ হবার পর ইনি মনস্থ করলেন যে ভার্জিনিয়ার পর্বতে পলাতক দাসদের জন্যে একটি দুর্গ রচনা করবেন। ১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে হার্পার্স ফেরীর সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করে জন কুড়ি অনুচর নিয়ে (এঁদের মধ্যে তাঁর দুই ছেলেও ছিল) তিনি গ্রাম দখল করলেন এবং কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে রাখলেন। ওয়াশিংটন থেকে ফৌজ এসে বিদ্রোহীদের দমন করল। ভার্জিনিয়ার আদালতে বিচারের পর ব্রাউনের ফাঁসি হল।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ততদিন রাষ্ট্র নিজেও মুক্ত ও নির্মল হবে না। এর মানে এই দাঁড়ায় যে মুক্ত রাষ্ট্রে কোন জোরজুলুম নেই। কেউ যদি রাষ্ট্রের তাঁবে থাকতে না চায় তাহলে রাষ্ট্র তার ওপর হামলা করবে না, তার সঙ্গে প্রতিবেশী বন্ধুর মত আচরণ করবে। এই যখন রাষ্ট্রের পরিণতি হবে তখন রাষ্ট্রশাসন পাকা ফলটির মত খসে পড়বে আর রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক উন্নত এক শুচীশুভ্র অবস্থায় আমরা উত্তীর্ণ হব।

মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রগুরুদের মধ্যে থোরো অন্যতম। ন্যায়ের দণ্ড শাসনদণ্ডের চেয়ে অনেক উপরে—টলস্টয় ও গান্ধীর এই জীবনসূত্র রচনা করে দিয়েছিলেন কংকর্ডের এই পলায়মান ভাবুক। যে যতবড় জ্ঞানীগুণী হোক না কেন তাকে গায়পায় খাটতে হবে—তার নিজের এবং সমাজের উভয়ের কল্যাণের জন্যে,—একথা বলেছেন অনেকে, কাজে করেছেন যে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক থোরো তাঁদের মধ্যে প্রথম।

১৮৫৪ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর বেডফোর্ডের নিকটে দক্ষিণ ডার্টমুথে বেঞ্জামিন আর. টাকারের জন্ম হয়। বস্টনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তখন থেকে তিনি ব্যক্তিপরায়ণ নৈরাজ্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইয়োরোপ ঘুরে এলেন। তাঁর নেশা ছিল সাময়িক পত্র চালানো। বারকয়েক বিফল হয়ে শেষে ১৮৮১ সালে বস্টনে তিনি "লিবার্টি" নামে একটি মাসিক পত্রিকা দাঁড় করালেন। কিছুকাল "লিবার্টাস" নামে আর-একটি জার্মান সংস্করণও বেরুল। ১৮৯২ সালে তিনি নিউইয়র্কে এসে বসলেন এবং "লিবার্টি"-কে সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। কয়েক বছর পরে এটি পাক্ষিক হল। ১৮৯৩ সালে তিনি "লিবার্টি"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির একটি সঙ্কলন বার করলেন—"ইনস্টেড অফ এ বুক....."। বই-এর দীর্ঘ নামের ব্যাঙ্গলা করলে দাঁড়ায়—'যে ব্যস্ত লোকের বই লিখিবার সময় নাই বইএর বদলে তাহার রচিত দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের টুকরা টুকরা ব্যাখ্যান'।

'পণ্যমূল্যের যথার্থ পরিমাপক শ্রম',—এডেম স্মিথ "ওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌"-এ এই যে সূত্রটি দিয়েছিলেন তার ওপরই উঠেছে সমাজবাদের শাস্ত্র। এ থেকে ওয়ারেন, প্রুদঁ ও মার্ক্‌স্‌ স্বতন্ত্রভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন,—শ্রমের ন্যায্য মজুরি তার পয়দা-করা মাল; এটাই একমাত্র ন্যায্য আয়ের পথ (অবশ্য দান, দায়াধিকার ইত্যাদির কথা আলাদা),—অন্য পথে যে যা আয় করে তা শ্রমিকের মজুরির ওপর ভাগ বসানো বই আর কিছু নয়; এই অন্যায় ভাগ বসানো তিন প্রকারে ঘটে থাকে—সুদ, ভাড়া, মুনাফা;—তিনটিই মূলধন খাটিয়ে লাভ করবার রকমফের। মূলধন শ্রমেরই সঞ্চয়—তার লাভ শ্রমিকের প্রাপ্য, ধনিকের নয়। তবু যে ধনিক অন্যায়ভাবে মূলধন থেকে লাভ তোলে, ব্যাঙ্ক সুদ খায়, জমিদার খাজনা নেয়, বেনিয়া মুনাফা রাখে তার কারণ আইনের বলে মূলধন এদের মৌরুসী। শ্রমিককে তার স্বাভাবিক মজুরি দিতে হলে, তার পয়দা মালের ভোগাধিকার দিতে হলে তার একমাত্র উপায় এই মৌরুসী স্বত্ব ভেঙ্গে দেওয়া।

এ পর্যন্ত মোটামুটি তিন সমাজবাদী সমমত। কেমন করে মূলধনে একচেটিয়া স্বত্ব ভাঙ্গতে হবে তাই নিয়ে হল মতভেদ।

মার্ক্‌স্‌ চাইলেন ধনিক শ্রেণীর একাধিকার নাশ করে রাষ্ট্রের একাধিকার স্থাপন করতে। রাষ্ট্র হবে একমাত্র মহাজন, কারিগর, চাষী, বেনিয়া—তার সঙ্গে কারও পাল্লা দেওয়া চলবে না। জমি, যন্ত্র, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদি উৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জাম হবে

সমাজের সম্পত্তি। শুধু উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য থাকবে ব্যক্তির জন্যে। সমাজ উৎপাদনের উপকরণগুলি হস্তগত করে রাষ্ট্রের মারফত পরিচালনা করবে, শ্রমের পরিমাপে পণ্যের দাম স্থির করবে, সবার জন্যে শ্রমবিভাগ করে দেবে। গোটা জাতি হবে একটা আমলাতন্ত্র। প্রজারা হবে সরকারের আজ্ঞাবাহী আমলা। রাষ্ট্র-সমাজবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে রাষ্ট্রপুঁজিবাদ।

ওয়ারেন আর প্রুদঁ দেখলেন ধনিক শ্রেণীর মৌরুসী স্বত্ব নির্ভর করছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর। রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়িয়ে, তার হাতে সার্বভৌম সর্বাধিকার সমর্পণ করে এর প্রতিকার হবে না। এর প্রতিকার রাষ্ট্রকর্তৃত্বের জায়গায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাঁড় করান, একচেটিয়া অধিকারের জায়গায় অবাধ প্রতিযোগিতা চালু করা। তা হলেই জিনিসের দাম শ্রমের স্তরে এসে ঠেকবে। এখন যে তা হচ্ছে না তার কারণ প্রতিযোগিতা চলছে একতরফে। ধনিকরা এমনভাবে আইন তৈরি করেছে যে শ্রমিকদের কাজে চলেছে অবাধ প্রতিযোগিতা, ফলে শ্রমের দাম নেমেছে অর্ধাশনের স্তরে; ব্যবসাবাণিজ্যেও আছে কিছুটা প্রতিযোগিতা যার ফলে ব্যবসার লাভও কিছুটা সীমিত; আর যে মূলধনের ওপর নির্ভর করছে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা, ব্যবসার লেনদেন তার সরবরাহে বলতে গেলে কোন প্রতিযোগিতাই নেই। কাজেই সুদ ও খাজনার হার সপ্তমে চড়ে আছে। দরকার হল মূলধনকে লাভের জন্যে না-খাটিয়ে জনসাধারণের কাজে নিয়োগ করা। মার্ক্‌স্‌ চাইলেন একে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে। ওয়ারেন ও প্রুদঁ চাইলেন একে ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিতে।

মৌরুসী স্বত্ব চার প্রকার—টাকা, জমি, শুল্ক ও আবিষ্কার। প্রথমটি প্রধান। টাকা তৈরি করা ও বাজারে ছাড়া সরকার ও ব্যাঙ্কগুলির একচেটে। যদি লগ্নির কারবার সকলের জন্যে মুক্ত করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ মূলধন সকলের আয়ত্ত হয় তাহলে লগ্নি টাকার দাম অর্থাৎ সুদ মূলধন চলাচলে যেটুকু খরচ তাতে এসে নামবে,—শতকরা এক-এর বেশি নয়। তখন ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেবে না, ব্যাঙ্কের মারফত চলাচল করবে মক্কেলদের টাকা। খাতক নামমাত্র সুদে টাকা পেলে বেশী লোক ব্যবসায়ে নামবে, শ্রমের চাহিদা বাড়বে, মজুরি বাড়বে, মজুরি টাকা জমিয়ে যন্ত্র কিংবা জমি কিনবে, শেষে স্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম অথবা জমি চাষ করবে। মূলধন শস্তা হলে পয়দা মালও শস্তা হবে। ঘর ভাড়াও কমবে কারণ ১% সুদে মূলধন পেলে ভাড়াটেরা টাকা ধার করে বাড়ি তুলবে, মোটা হারে বাড়িভাড়া দেবে না।

বর্তমানে জমি চাষ না-করেও এবং তাতে বসবাস না-করেও যে অনেকে তার মালিক হয়ে বসে আছে এ শুধু সরকারের ভূমিস্বত্ব আইনের জোরে। যে জমি চাষ করে অথবা জমিতে ঘর তুলে বসবাস করে সে ছাড়া আর কেউ জমির মালিক হতে পারবে না এমন নিয়ম হলে ভাড়া নেওয়া উঠে যাবে। অবশ্য ভাল জমির সুবিধা এবং আয় মন্দ জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু জমি ও বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে অন্যায় ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে জমির গুণাগুণ থেকে তেমন কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না।

তারপর শুল্কের একাধিকার। অল্প খরচে অনুকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্য যারা কিনে পোষণ করতে চায় তাদের ওপর কর বসিয়ে বেশী খরচে প্রতিকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্যকে পোষণ করার যে সরকারী নীতি তার নাম শুল্কের একাধিকার। এই অধিকার সরিয়ে নিলে অর্থাৎ শুল্ক তুলে দিলে পণ্যের দাম কমবে, শ্রমিক শস্তায় জিনিস কিনতে পারলে তার জীবনের মান উন্নত হবে। অবশ্য প্রুদঁ সাবধান করে দিয়েছেন যে টাকার একাধিকার বন্ধ না-করে শুল্কের একাধিকার বন্ধ করলে সর্বনাশ হবে কারণ যে অল্প পরিমাণ টাকা দেশের

বাজারে ঘুরছে তা বিদেশের শস্তা আমদানি মালের পিছনে বিদেশে চলে যাবে, দেশের শুল্ক-রক্ষিত ছোট শিল্পগুলি মারা পড়বে। বিদেশের সঙ্গে অবাধ পণ্যবিনিময়ের আগে দেশে টাকার অবাধ চলাচল আনতে হবে।

আবিষ্কারের ওপর মৌরুসী স্বত্ব প্রকৃতির সার্বজনীন বিত্তের ওপর অবৈধ একাধিকার। প্রকৃতির সম্পদ সকলের ভোগ্য। যখন একজন প্রকৃতির কোন নিয়ম বা সত্যকে আবিষ্কার করে তার ওপর একাধিকার বসায় এবং অন্যকে তার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন তা অসম, অবৈধ। এই অধিকার দূর করলে আবিষ্কর্তাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজের পরিশ্রমের অতিরিক্ত অন্যায় সুবিধা সে ভোগ করতে পারবে না।

এই চারটি একচেটে অধিকার তুলে নিলে ব্যক্তি হবে অবাধ, মুক্ত। মার্কস্ ব্যক্তির হাত থেকে মূলধন নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে দিয়েছেন, ব্যক্তিকে শূন্য করে রাষ্ট্রকে পূর্ণ করেছেন। ওয়ারেন ও প্রুদ* রাষ্ট্রাশ্রয়ী একাধিকারগুলিকে কেড়ে নিয়ে মূলধন ব্যক্তির হাতে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকে শূন্য করে ব্যক্তিকে পূর্ণ করেছেন।

> নৈরাজ্যবাদীরা নির্ভীক জেফারসনীয় 'গণতান্ত্রিক,' তার বেশী কিছু নয়। তাহাদের বিশ্বাস, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল' এবং যে সরকার আদৌ শাসন করে না তা সরকারই নয়। (১৪ পৃষ্ঠা)

সরকার মানেই শাসন, নিয়ন্ত্রণ। যে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে অত্যাচারী, আক্রমণকারী। এ আক্রমণ নানা প্রকারে হতে পারে, যথা ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা চোর গুণ্ডা ইত্যাদি করে থাকে; সমষ্টির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা স্বৈরাচারী রাজা করে থাকে; ব্যক্তির ওপর সমষ্টির আক্রমণ যা আধুনিক গণতন্ত্র করে থাকে; আর যারা এই নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় তারা আক্রমণকারী নয়, আত্মরক্ষক। চোরগুণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করা, স্বৈরাচারী শাসনে বাধা দেওয়া, সংখ্যাগুরুর গণতান্ত্রিক আইন অমান্য করা, সব আক্রমণ-বিরোধী আত্মরক্ষামূলক কাজ। ভোটপত্র দিয়ে রাষ্ট্রের দমনপর চরিত্র ঢাকা পড়ে না। কোন পক্ষের জোর বেশি এবং কার কাছে মাথা নোয়াতে হবে সেটা নির্ধারণ করবার জন্যে ভোটপত্র একটা সোজা উপায়।

রাষ্ট্রশাসক তথা স্বাধীনতার শত্রুরা তিন মূর্তিতে দেখা দেয়। প্রথমত, যারা স্বাধীনতাকে প্রগতির লক্ষ্য ও উপায় বলে মানে না, যেমন ক্যাথলিক চার্চ ও রুশ সরকার। দ্বিতীয়ত, যারা নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনতার জয়গান গায় কিন্তু অপরকে স্বাধীনতা ভোগ করতে দেয় না, যেমন প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চ এবং ম্যাঞ্চেস্টারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায়। তৃতীয়ত, যারা স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলে মেনে নেয় কিন্তু উপায় বলে মানে না এবং আগে স্বাধীনতাকে পদদলিত করে পরে তাকে মাথায় তুলতে চায়, যেমন কার্ল মার্কস্-এর সমাজতন্ত্র। মার্কস্‌বাদীরা বলে যে প্রলিতারিয় শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হয়ে যাবে সুতরাং স্বাধীনতা খর্ব হবে না। তা বটে, তারা এক হয়ে যাবে ঠিক 'যেমন সিংহ ভেড়ার বাচ্চাটিকে গিলে ফেলবার পর দুটিতে এক হয়ে যায়।'

রাষ্ট্রকে বাতিল করে দিলেই যে আক্রমণ বন্ধ হবে তা নয়। হতে পারে যে কোন কোন লোক প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর হামলা করবে। তার প্রতিকারের জন্যে তৈরী হবে আত্মরক্ষণশীল সংস্থার যা রাষ্ট্রের মত বাধ্যতামূলক নয়—যার ভিত্তি সকলের স্বাধীন ইচ্ছা।

* অর্থাৎ জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ব্যক্তি-অধিকারের মৌলিক নীতির ওপর যে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেছিলেন তার অনুবর্তী।

এই সংস্থা আক্রমণকারীকে সর্বতোভাবে বাধা দেবে। অনেকের মনে হতে পারে যে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রই ত স্বেচ্ছামূলক আত্মরক্ষণ সংস্থা। তা নয়। রক্ষণের চেয়ে আক্রমণের দিকে এর নজর বেশ। রক্ষণের নাম করে এ যে সকলকে খাজনা দিতে বাধ্য করে এইটেই একটা আক্রমণ। একজনের হয়ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই—তবু তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, এমন কি তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে কর নিচ্ছে। রক্ষণের কাজ এখন রাষ্ট্রের একচেটে। আত্মরক্ষা সমিতির হাতে এলে রক্ষণের কাজে প্রতিযোগিতা হবে, অন্যান্য পণ্যের মত এরও দাম কমবে, যে যত শস্তায় কাজ দেবে সে তত সমর্থন এবং চাঁদা পাবে।

আক্রমণকারী ব্যক্তিকে তৈরি করে আক্রমণকারী রাষ্ট্র। অপরাধের উৎপত্তি হয় অভাব থেকে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্র অভাব সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র উৎসন্ন হলে মূলধনের ওপর মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে, অভাব দূর হবে, অপরাধবৃত্তি থাকবে না, জেল পুলিশ ও সান্ত্রীর দরকার হবে না।

> রাষ্ট্র আমাদের মুশকিল-আসানের কাজ করে বটে কিন্তু আমাদিগকে হাতকড়া পরাইয়া তাহার দাম আদায় করিয়া লয়। স্বাধীনতার একটা বিকল্প পথ আছে এবং তাহাতে আরো শস্তাদরে মুশকিল-আসান হয়। সমবায় ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ধনের উৎপাদন বাড়াইতে এবং তার ন্যায়সংগত বণ্টন করাইতে পারে.....সমবায় বীমা আপদে বিপদে ক্ষতিপূরণ দিয়া আকস্মিক ধনক্ষয়জনিত কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লাঘব করিতে পারে (১৫৯-১৬০)। আত্মরক্ষা সমিতি আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করিতে, শাস্তি দিতে, আটক রাখিতে, এমনকি মারিয়া ফেলিতেও পারে (৫৫, ৫৬)। সভ্যদের ভিতর হইতে লটারীতে নির্বাচিত জুরী অপরাধের বিচার করিতে পারে—তাহাদের বিচার্য হইবে শুধু ঘটনা নয়, আইনও—আইনের ন্যায্যতা, ঘটনাক্ষেত্রে ইহা প্রযুজ্য কিনা এবং প্রযুজ্য হইলে আইনভঙ্গের জন্য কি পরিমাণ শাস্তি অথবা জরিমানা হইবে। (৩১২)।

স্বেচ্ছাসমিতি গঠিত হবে চুক্তি দ্বারা। কোন এলাকার ওপর এর রাজত্ব থাকবে না, যদিও চুক্তিবদ্ধ সভ্যরা জমির মালিক হতে পারে এবং চুক্তির নিয়মে নিজের নিজের জমিতে সুরক্ষিত হতে পারে। আবার তাদের মধ্যবর্তী কোন জমির মালিক সমিতির বাইরে থাকতে পারে এবং সমিতির কোন সভ্য পরে সমিতি ছেড়ে যেতেও পারে। কিন্তু সভ্যদের সম্মতিতে যে নিয়ম ধার্য হয়েছে তা প্রয়োগ করবার অধিকার সমিতির থাকবে। সমিতি সভ্যদের শর্ত ধার্য করতে পারে—যেমন জুরীতে বসা কিংবা খাজনা দেওয়া। সমিতি চুক্তিভঙ্গ করে সভ্যদের ওপর হামলা করতে গেলেই তার খাজনা বন্ধ হবে, সমিতি ভেঙে যাবে।

আশঙ্কা হতে পারে যে এতে করে ব্যাঙের ছাতার মত স্বেচ্ছাসমিতি গজিয়ে উঠে পরস্পর বিবাদ শুরু করবে। সে ভয় নেই। কারণ এই ব্যবস্থা বাস্তবে চালু হবার আগে মানুষের মনকে স্বাধীনতার জন্যে তৈরি করতে হবে—যাতে তারা তাদের ব্যাপারে বাইরের কোনরকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত না করে। তা হলেই যে সমিতি হবে সবচেয়ে নিরুপদ্রব সেই সমিতি তাদের সমর্থন পাবে এবং ঝগড়াবিবাদের ভয় থাকবে না। অবশ্য কখনই যে ঠোকাঠুকি লাগবে না তা নয়। যেমন 'ক' সমিতির সভ্য 'খ' সমিতির সভ্যের ওপর হামলা করেছে। 'খ' 'ক'-এর সভ্যকে গ্রেপ্তার করতে গেল, 'খ' রুখে দাঁড়াল কারণ তাদের মতে গ্রেপ্তারটা আক্রমণাত্মক।

এ জাতীয় বিবাদেরও সমিতিতে সমিতিতে চুক্তিদ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে,—একটি অন্তর-সমিতি আদালতও স্থাপিত হতে পারে।

> দেশরক্ষা একটা পণ্য, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের অনুগত। খোলা বাজারে এই পণ্য বিক্রয় হইবে উৎপাদনমূল্যে। যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইলে সবচেয়ে শস্তায় সেরা মাল যে দিবে তাহার মালই বিকাইবে। বর্তমানে এই পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া। সকল একচেটিয়া বেনিয়ার মত রাষ্ট্র এই পণ্যের জন্য চড়া দাম আদায় করে, উপরন্তু বাজে মাল দেয়। খাদ্যের একচেটিয়া ব্যবসাদার যেমন পুষ্টির বদলে বিষ দেয়, দেশরক্ষার একচেটিয়া ব্যবসায়ী রাষ্ট্র তেমন রক্ষণের বদলে দেয় আক্রমণ; প্রথমের ক্রেতারা দাম দেয় বিষ খাইয়া, দ্বিতীয়ের ক্রেতারা দাম দেয় দাসত্বের শিকল পরিয়া। একটা ব্যাপারে রাষ্ট্র সকল একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে ছাড়াইয়া যায়। তাহার এই একটা মস্ত সুবিধা যে তাহার পণ্য কেহ নিতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, সে সকলকে ইহা কিনিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং যদি একই এলাকায় পাঁচছয়টি রাষ্ট্র তাহাদের বেসাতি লইয়া বসে তবে মনে হয় লোকে ঠিক দামে সবচেয়ে সেরা নিরাপত্তা কিনিতে পারিবে। তাহাদের কাজ যতই ভাল হইবে ততই তাহাদের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে—বহুরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ফলে কোন রাষ্ট্রই টিকিবে না। (৩৩)

নিরাজ ব্যবস্থায় মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে কিন্তু বিত্তাধিকার থাকবে। নিজের পরিশ্রমে যে যা অর্জন করেছে, কিংবা জবরদস্তি ও প্রতারণা না-করে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে, কিংবা স্বাধীন চুক্তির বলে যে যাকিছু ভোগদখল করেছে তাতে তার স্বত্ব বর্তাবে। অবশ্যি জমি অথবা এমন কোন জিনিস যা সকলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করার মত যথেষ্ট মজুত নেই, তার মালিকানা কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যারা সেখানে চাষ করছে বা তা ব্যবহার করছে।

নিরাজ ব্যবস্থায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিকার দূর হবে না—ধর্ম, নীতি, সমাজ, পরিবার সর্বত্র শাসন দূর হবে, স্বাধীনতা আসবে। একটি মাত্র নীতিকথা সবাইকে মানতে হবে—'নিজের চরকায় তেল দাও'। জোর করে অন্যের পাপ দমন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

> নৈরাজ্যবাদী মনে করে যে স্বাধীনতা এবং তার প্রসূত সমাজকল্যাণ সকল পাপের ধন্বন্তরী। কিন্তু সে স্বীকার করে মাতাল, জুয়াড়ি, লম্পট ও পতিতার ইচ্ছামত জীবনযাপনের অধিকার, যতদিন না তাহারা সে জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবে। (১৫)

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ একটি আইন করে স্থির হয়েছে যে সিফিলিস রোগগ্রস্ত কয়েদী ও অন্যাশ্রমের নিঃস্বদের রোগমুক্ত না হলে ছাড়া হবে না। সিফিলিস রোগ বড়-একটা সারে না সুতরাং তাদের দণ্ড যাবজ্জীবন কারাবাস। 'এখন থেকে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ শুধু বড়লোক ও আইনমান্যকারীরা সিফিলিসসহ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।'

নিরাজ সমাজে সন্তানপালনের দায় পিতামাতার, সমাজের নয়। পিতামাতা নির্বাচন করবে ধাত্রী ও শিক্ষক। পিতামাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না, তাদের দায়িত্বও অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না। বাপমার বিরুদ্ধে সন্তানের কোন অধিকার নেই। যদি তারা

সন্তানের অযত্ন করে তাতে কারও কিছু বলবার নেই। পরিত্যক্ত অথবা অনাথ শিশুকে পালন করবার বোঝাও সমাজ বইবে না—কেউ স্বেচ্ছায় বইতে চায় ত' আলাদা কথা।

যৌনসম্বন্ধ হবে মুক্ত, উভয়পক্ষের ইচ্ছাধীন। আইনের বিবাহ ও আইনের বিচ্ছেদ সমান অদ্ভুত। প্রত্যেক নরনারী স্বাবলম্বী হবে, প্রত্যেকের নিজের বাড়ি অথবা অন্তত একটি ঘর থাকবে, তাদের প্রেমসম্বন্ধ হবে ব্যক্তিগত রুচি ও আসক্তির মত বৈচিত্র্যশালি। এ থেকে যে সন্তানরা আসবে তারা নাবালক অবস্থায় মা-র হেপাজতে থাকবে, তারপর নিজের পায় দাঁড়াবে।

> পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে অবশ্য পূর্ণ সমতা আসবে না। অনেকে স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যকে বেশী পছন্দ করে। আমি তাদের মধ্যে নই। আমি যদি মুক্ত ও সচ্ছল অবস্থায় জীবন কাটাইতে পারি তবে আমার প্রতিবেশীকে সমান মুক্ত কিন্তু বেশী সচ্ছল দেখিয়া আমি ঈর্ষাকাতর করিব না। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সকলকে সচ্ছলতা দিবে, কিন্তু সমান সচ্ছলতা নয়। শাসন সকলকে সমান টাকার থলি দিতে পারে (নাও পারে); কিন্তু যাহা কিছু জীবনকে বাঁচিবার উপযুক্ত করে, সেই ধনে সকলকে সমান নির্ধন করিয়া ছাড়িবে। (৩৩৩)

সমাজবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের কোন বিবাদ নেই, কোন অটুট সম্পর্কও নেই। সমাজবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটি একটি চৌর্যবিরোধী আন্দোলন,—শ্রমিকের শ্রমফল চুরি বন্ধ করার আন্দোলন। এ আন্দোলন চায় বিত্তবানের একাধিকার ও বিশেষ সুবিধা দূর করে সকলকে যার যার ন্যায্য পাওনা দিতে। নৈরাজ্যবাদ চায় সকলকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে এই শর্তে যে কেউ অপরের স্বাধীনতায় হাত দেবে না। সমাজবাদের লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যবাদের লড়াই শাসনের বিরুদ্ধে। যেহেতু শোষণ নির্ভর করে শাসনের ওপর, ধনিক শোষণ চালায় সরকারী আইনের জোরে, এবং যেহেতু রাষ্ট্রশাসন বরবাদ হলে ধনিকশোষণও বরবাদ হবে, সেহেতু নৈরাজ্যবাদী বস্তুত সমাজবাদীও বটে।

শুধু শাসনের অবসান হলেই নিরাজ সমাজ আসবে না। যারা স্বাধীনতা চায়, তাকে যত্ন করে রাখতে পারে, কেবল তাদের জন্যেই নিরাজ সমাজ। বর্বরযুগে যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার দাম তারা বুঝত না, তাই তারা তা হারিয়েছে। সেই অন্ধযুগের সমাজ নৈরাজ্যের আদর্শ নয়।

শিকাগো হেমার্কেটের শহীদরা তাদের আদর্শের জন্যে জীবন দিয়েছে,—তারা নমস্য। কিন্তু তারা ব্যক্তিনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদের পূজারী নয়। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে তারা এক সর্ব-নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকতন্ত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যেখানে সবাইকে উৎপাদন ও পণ্যবিনিময় করতে হবে নির্ধারিত ব্যবস্থায়, যে ব্যবস্থা আনবার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে এবং যারা নিজের খুশিমত উৎপাদন ও বিনিময় করতে চায় তাদের দমন করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবে পরাজয় অবধারিত, তারপর শতাব্দব্যাপী শাসন ও উৎপীড়ন; আর সফল হলেও তার পরিণতি হবে স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার পথ ধীর, অবিরাম এবং সুনিশ্চিত—তিলে তিলে সরকারের এলাকায় জবরদখল করা, সরকারের একচেটে ব্যবসায়ে নিজেদের অধিকার ঘোষণা করা, এই হল বাস্তব পন্থা।

নৈরাজ্যবাদীরা বৈষ্ণব নয়, নীতিবাগীশ অহিংসও নয়। হিংসা যেখানে কার্যকরী সেখানে হিংসা চাই। যখন কথা বলবার অধিকার থাকবে না, যখন সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হবে, তখন অবশ্যই বোমা ও ডাইনামাইট দরকার হবে। কারণ তখন কোন শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম

সম্ভব হবে না। অন্যথায় সন্ত্রাসনীতি হবে আত্মঘাতী। ষড়যন্ত্র, রক্তারক্তি, জিঘাংসা ইত্যাদি যে ক্লেদ'ল্যানি নিয়ে আসবে তা থেকে সমাজকে বাঁচানো যাবে না।

মুক্তসমাজে পৌঁছবার দু'ট উপায় আছে—একাট মিলনাত্মক আর একটি বিরোধাত্মক। মিলনাত্মক কাজ হল ব্যয়ের সমান মূল্য ধরে উৎপাদন ও বিতরণ চালাবার সমিতি গড়া, সমবায় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও বীমা সমিতি গঠন করা, ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত ওয়ারেনের 'সময়ভাণ্ডার', প্রুদ'র 'বিনিময় ব্যাঙ্ক'।

বিরোধাত্মক উপায় হল—খাজনা দেওয়া বন্ধ করা, আইন অমান্য করা, সরকারী কর্মচারীদের একঘরে করা, পুলিশ ও সেনার জুলুমকে শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দেওয়া এবং দলে দলে জেলে যাওয়া। খাজনাবন্ধ হল মোক্ষম অস্ত্র। সরকার যদি অনাদায়ী খাজনা মাপ করে দেয় তা হলে খাজনা না-দেনেওলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে; আর যদি জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করতে যায় তবে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে। যদি এক-পঞ্চমাংশ লোক খাজনা বন্ধ করে তবে বাকি চার-পঞ্চমাংশের খাজনায় খেলাপীদের খাজনা আদায়ের খরচ উঠবে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধে কেমন কাজ হয় তা দেখিয়েছে আয়র্ল্যাণ্ডের ল্যাণ্ড লীগ। ইংল্যাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে পার্নেল আইরিশ চাষীদের নিয়ে এই কৌশলে লড়াই করেছিলেন। এ ব্যর্থ হবার কারণ আইরিশ নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—চাষীদের কর-মুক্তি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাই রাজনৈতিক সুবিধার লোভে তাঁরা যুদ্ধ সম্বরণ করলেন।

> আজকালকার সামরিক শৃঙ্খলার দিনে এই একমাত্র প্রতিরোধ যাহাতে কোন কাজ হইতে পারে। সভ্যজগতের যাবতীয় স্বেচ্ছাচারী শাসক বরং সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অবতারণা করিবে কিন্তু তাহাকে অমান্য করিতে বদ্ধপরিকর একদল প্রজার সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা যায়। কিন্তু যে নিরুপদ্রব লোকেরা রাস্তায় জড় হয় না পর্যন্ত, কেবল ঘরে বসিয়া আপন আপন অধিকার রক্ষা করে তাহাদের উপর গুলি চালাইবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোন সেনাবাহিনীর নাই। (৪১৩)

ক্ষমতা বেঁচে থাকে পরের স্বত্ব গ্রাস করে। শিকার যখন নিজের স্বত্ব আগলে দাঁড়ায় তখন ক্ষমতার মৃত্যু অবধারিত। মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, ভোট দিয়ে, কিংবা গুলি করে ক্ষমতাকে বধ করা যায় না, বধ করবার একমাত্র উপায় অনাহার। খাদ্য না জুটলেই সে মরবে। সরকারকে খাজনা না দিয়ে স্বেচ্ছাসমিতিকে চাঁদা দাও। সরকারী মুদ্রা না ছুঁয়ে নিজের মুদ্রায় বেচাকেনা কর, নিজেরা সমিতি গড়ে ব্যাঙ্ক বীমা খোল, সরকার আপনিই খতম হবে।

টাকারের নৈরাজ্যবাদ প্রুদ' ও স্টার্নারের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। প্রুদ' থেকে তিনি নিয়েছেন স্বাধীন সমিতি দ্বারা লোককর্ম পরিচালনার পদ্ধতি, স্টার্নারের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিবাদ।

> নৈরাজ্যবাদীরা শুধু প্রয়োজনসর্বস্ব নয়, তাহারা পুরামাত্রায় আত্মম্ভরীও বটে। মৌলিক অধিকারের মাত্রা জোর। যে কোন ব্যক্তি, তাহার নাম বিল সাইক্স্ কিংবা আলেকজাণ্ডার রোমানফ যাই হোক না কেন, কিংবা একদল লোক তাহারা চীনের ডাকাত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যাই হোক না কেন, যদি তাহাদের অপরকে বধ করিবার বা বশ করিবার, কিংবা সারা দুনিয়াটা দখল করিবার শক্তি থাকে তবে সে অধিকারও তাহাদের আছে। সমাজের ব্যক্তিকে দাস বানাইবার অধিকার এবং ব্যক্তির সমাজকে দাস বানাইবার অধিকার সমান নয় তার কারণ

> তাহাদের শক্তি সমান নয়। (২৪)

টাকারের দুর্বলতা এইখানে। প্রয়োজন বোধ ও অহঙ্কার রাষ্ট্রের বিকল্প জনশক্তি গড়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে সকলকে জমিজমা ও মূলধন খাটাবার অধিকার দিলেই আর্থিক বৈষম্য মিটে যাবে এ কল্পনা অবাস্তব। সরকার ও ধনতন্ত্রের এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সমদর্শী অর্থসংগঠন গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, ওয়েনের নিউ লানার্কের কারখানা, ওয়ারেনের সময় ভাণ্ডার ও প্রুদ'র বিনিময় ব্যাঙ্ক তার প্রমাণ। টাকারের সার্থক অবদান নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কৌশল। তাঁর এই অবদান টলস্টয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। গান্ধীর হাতে এ কৌশল পরীক্ষিত হয়েছে। এজন্যে নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়।

শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে পটপরিবর্তন হচ্ছিল। ধনতন্ত্রের বিস্তারের সংগে সংগে এগিয়ে আসছিল শ্রমিক আন্দোলন। বাঘের পিছনে ফেউর মত ধনতন্ত্রের পিছনে ছোটে বাজারমন্দা ও আর্থিক সঙ্কট, তার ঘা এসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর, তাদের বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটা অংশ ছিল বিদেশী—বিশেষ করে জার্মান। এরা ছিল বনেদি আমেরিকানদের চেয়ে উগ্র। দুই শ্রেণীর দুটি সংস্থা ছিল—নরমদের সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি, গরমদের রিভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি। শেষেরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮১ সালে। এর নেতা ছিলেন এলবার্ট পারসনস ও অগাস্ট স্পাইস। এঁরা শিকাগোতে এক সম্মেলন করে প্রস্তাব নিলেন যে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে এবং তাদের অধিকারের ওপর হামলা হলে তারা বন্দুক চালাতে কসুর করবে না। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপাকের চাপে দলে দলে শ্রমিক নরম দল ছেড়ে এসে গরম দলে ভিড়তে লাগল।

এমন সময়ে আসরে একটি ব্যক্তির আবির্ভাব হল যাঁর মাথায় রামরাজ্যের কল্পনা ও প্রতিশোধের উত্তেজনা একসঙ্গে দানা বেধেছিল। 'নূতন পৃথিবীতে ইনিই হলেন বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের প্রবর্তক, জোহান মোস্ট, জাতিতে জার্মান। ১৮৪৬ সালে অগস্বার্গে তাঁর জন্ম হয়। অতি দুঃখের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং অস্ত্রোপচারে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। বই বাঁধাইর কাজ শিখে তিনি পাঁচ বছর মধ্য ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বিকৃত চেহারার অভিশাপ। মানবজাতির ওপর বিদ্বেষে মন ভরে গেল। তা সত্ত্বেও রয়ে গেল অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা। সামান্য শিক্ষায় যতদূর সম্ভব তিনি পড়াশুনা করলেন এবং কার্ল-মার্ক্স্এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে যোগ দিলেন। শীঘ্রই আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর খ্যাতিলাভ হল এবং কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করে তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠলেন।

১৮৭৯ সালে মোস্ট জার্মানী থেকে পালিয়ে এলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে "ফ্রাইহাইট" (স্বাধীনতা) নামে একটি পত্রিকা বের করে তিনি গোপনে জার্মানীতে প্রচার করতে লাগলেন। এর সুর ছিল অত্যন্ত চড়া এবং হিংসাত্মক। এই সুর ছিল জার্মান দলের নীতিবিরুদ্ধ, ফলে তিনি আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন। আর একবার জেল খেটে মোস্ট এলেন নিউ ইয়র্কে (১৮৮২) এবং বিপ্লবী সমাজবাদী দলে ভিড়ে পড়লেন। এরা তাঁর মত নৈরাজ্যবাদী ছিল না। তবে এরাও ছিল তাঁর মত ভোটতন্ত্রে অবিশ্বাসী ও হিংসায় আস্থাবান। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে পিট্স্বার্গে উভয় পক্ষ একসঙ্গে সম্মেলন

করে একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করল। ফেডারেশন শ্রমিকদের আহ্বান করল অস্ত্র ধারণ করতে। কারণ, 'কেবল মজুরির লড়াই দিয়ে কিস্তিমাত করা যাবে না, সুতরাং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয়দের সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিতে বাধ্য।'

সংগঠন বাড়তে লাগল দ্রুত। দু' বৎসরের মধ্যে এর সভ্য হল সাত আট হাজার। এদের অধিকাংশ জার্মান, বেশ কিছু অন্যান্য ইয়োরোপীয়, অল্প কিছু আমেরিকান। ফ্রাইহাইট ইল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—এখন নিউ ইয়র্ক থেকে বেরুতে লাগল। এ ছাড়া "আরবাইটার সাইটুং" বা শ্রমিক সমাচার নামে একটি জার্মান দৈনিক এবং এলবার্ট পার্সনস-এর সম্পাদনায় "এলার্ম" নামে একটি ইংরাজী দৈনিক শিকাগো থেকে বেরুতে লাগল। ফ্রাইহাইটে মোস্ট খোলাখুলিভাবে সন্ত্রাসনীতি সমর্থন করতে লাগলেন। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয় এবং শ্রেণীযুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হয় তার পাঠও এতে থাকত। এরপর তিনি "রিভালিউশিয়নের ক্রিগ্‌স্‌উিসেনশাফ্‌ট্" (বিপ্লবী সমরবিজ্ঞান) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এতে শুধু বিস্ফোরক বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ ছিল না, কেমন করে এগুলো সংগ্রহ করতে হবে, কেমন করে টাকা জোগাড় হবে—চুরি জোচ্চুরি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়, অদৃশ্য কালি প্রস্তুত করা, বড়লোকদের ভোজসভায় খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, আগুন লাগাবার জন্যে প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ব্যবহার, ইত্যাদি বহু তথ্যের ফিরিস্তি ছিল। শেষের প্রক্রিয়ায় নিজেদের দোকান ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মোস্টের অনেক শিষ্য অগ্নিবীমা কোম্পানীর টাকা মারতে লাগল। এ ছাড়া অন্যান্য চোর গুণ্ডারাও মোস্টের সমরবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছিল। মোস্ট এদের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সাহিংস ও গর্হিত কর্মের স্তুতিতে তিনি গুরু বাকুনিনকে ছাড়িয়ে গেলেন।

১৮৮৬ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে এল আট ঘণ্টা কাজের দাবি। অতলান্ত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ধর্মঘটে মেতে উঠল। উত্তেজনা চণ্ড মূর্তি ধরল শিকাগো শহরে। ম্যাককর্মিক শস্যকাটার কারখানায় মজুরদের দশ ঘণ্টা খাটানো হচ্ছে শুনে পয়লা মে একদল ধর্মঘটী সেখানে হামলা করল। পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। একজন শ্রমিক প্রাণ হারাল। চোঠা মে র‍্যানডল্‌ফ্ স্ট্রীটে হে-মার্কেট স্কোয়ারে জমল প্রতিবাদ সভা—বক্তৃতায় আগুন ছুটল। কিছুক্ষণ পরে এল পুলিশবাহিনী, আদেশ হল সভা ভাঙতে হবে। জবাবে একটি বোমা এসে পড়ল তাদের মধ্যে। পুলিশের একজন এবং জনতার কয়েকজন ধরাশায়ী হল। তখন দুপক্ষই রিভলভার টেনে বের করল, গুলিবৃষ্টি হল এক পশলা। পুলিশের পক্ষে মরল সাতজন, আহত হল জনা পঁচিশ। অপর পক্ষে হতাহতের সংখ্যা জানা যায় না, অনুমান জন পঞ্চাশ।

কে যে প্রথম বোমাটা ফেলেছিল তা আজও কেউ জানে না। অথচ হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সভার বক্তারা, তার মধ্যে এলবার্ট পার্সনস ও অগাস্ট স্পাইস। এঁদের নিয়ে সাতজন আসামীর হল প্রাণদণ্ড, একজনের পনের বছরের কারাদণ্ড। মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে তাঁবেদার জুরী বসিয়ে অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীদের মতবাদ হল অপরাধ প্রতিষ্ঠার মস্ত বড় নজির। একজন তার জবানীতে বলেছিল,

> আমি এদেশে পনের বৎসর বাস করিয়াছি এবং এখানকার ভোটপ্রথা এবং প্রশাসনিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, দেখিয়াছি যে শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কোন নীতির বালাই নাই। ধনী ও দরিদ্র সমান অধিকারসম্পন্ন বলিয়া আমার যেটুকু বিশ্বাস ছিল আমার এদেশের অভিজ্ঞতা তাহা মুছিয়া দিয়াছে। আমলা পুলিশ

> ও সিপাহীদের কীর্তিকলাপ আমার মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে এই অবস্থা আর বেশীদিন চলিতে পারে না।

এই জাতীয় নির্ভীক্ স্বীকারোক্তি এবং নৈরাজ্যবাদী পত্রিকার বিস্ফোরকশাস্ত্র হত্যার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হল। সুপ্রীম কোর্টের আপীলে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রইল। ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর সাতজনের ফাঁসি হল। সাত বৎসর পরে যখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে তখন তদন্ত করে জানা গেল যে ঐ আটজনের একজনও হত্যার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল না।

সে যাহোক, শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে পয়লা মে'র স্মৃতি রক্ত ও আগুন দিয়ে চিহ্নিত হয়ে রইল।

এর পর থেকে ইয়োরোপের মত আমেরিকাতেও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন হিংসা ও সন্ত্রাসের কুটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৮৯২ সালে পেনসিলভেনিয়ার হোমস্টেডে কার্নেগী ইস্পাত কোম্পানীর কারখানায় শ্রমিক ও সান্ত্রীদের মধ্যে একটা লড়াই হয়ে গেল। দুপক্ষেই যখন বেশ কিছু হতাহত হয়েছে তখন এল জগ্গী পুলিশ, শ্রমিকরা যুদ্ধে পরাস্ত হল। কিন্তু তার আগে আলেকজাণ্ডার বার্কম্যান নামে একজন তরুণ এনার্কিস্ট জেনারেল ম্যানেজার হেনরি ফ্রিক-এর অফিসে ঢুকে তাঁকে গুলি করলেন। ফ্রিক সেরে উঠলেন। বার্কম্যানের ষোল বছর কারাদণ্ড হল।

১৯০১ সালে রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম ম্যাকিনলে লেয়ন চলগশ নামে একজন পোল আমেরিকানের হাতে নিহত হলেন। চলগশ নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য ও ডাইনামাইট শাস্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী চক্রের মাতব্বররা তাকে পাত্তা দিত না। তার সততার ওপরেও কটাক্ষ করা হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে নিজের সততা ও যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যেই সে বেচারা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার পরীক্ষায় নেমেছিল।

আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের তখন শেষ দশা। মোস্টের তখন বয়স হয়েছে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তিনি বার্কম্যানের কাজের স্তুতি করলেন না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিষ্যা এম্মা গোল্ডম্যান গুরুকে ত্যাগ করলেন। দলে ভাঙন ধরল। এদিকে তখন সিণ্ডিক্যালিজম্-এর আসর পড়ছে—আই. ডব্লিউ. ডব্লিউ গড়ে উঠছে, তাতে তৈরী হচ্ছে স্বর্গরাজ্যের যাত্রাপথ আর সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে পাইকারি প্রতিহিংসার বন্দোবস্ত। শহীদ হয়ে কল্পনার আত্মতুষ্টি লাভের চেয়ে ধনিককে ধনেপ্রাণে মারবার এই নতুন কল অনেক শ্রেয়। আমেরিকার শ্রমিক ঝুঁকল এই নতুন রাস্তায়।

কুশাঙ্কুর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দুই প্রৌঢ় বন্ধু সুখ দুঃখের গল্প করছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। অন্দরের দরজায় নীল রঙের পুরু পর্দা ঝুলছিল। বাইরের দরজাতেও অমরেশ সেন খিল তুলে দিয়ে এসেছিলেন। রেডিওতে একটু আগে যে রাগ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজছিল তাও তিনি উঠে গিয়ে বন্ধ করে এলেন। অতিথি সতীকান্ত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ওকি করছ। ভিতর থেকে কেউ হয়তো শুনছিলেন—।' অমরেশ বললেন, 'আরে না না। অনেক সময় কেউ না শুনলেও ওটা বাজে। দোকানের রেডিওর মত ওটা সহজে বন্ধ হতে চায় না।'

গালে কপালে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখায়, গলার স্বরে অমরেশের বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। সতীকান্ত বন্ধুর এই রূঢ়তাটুকু লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন এই বোধ হয় প্রৌঢ় বয়সের ধর্ম। কথায় বার্তায় চালচলনে সহজেই অসহিষ্ণুতা বেরিয়ে পড়ে। নিজের অজ্ঞাতে শরীরে মনে কর্কশতা এসে স্থায়ী আসন পাতলে মাথার চুল কটা হয়, দাড়ি কড়া হয়, পাক ধরে আর হৃদয়ও শক্ত হয়ে ওঠে। অমনিতে অমরেশ সেন ভালোই আছে। ওকালতিতে পসার বেড়েছে। চেহারায় স্বাস্থ্য আর স্বচ্ছলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও তা ধরবার জো নেই। কিন্তু চাল চলনে ধরা পড়ে যৌবন বিগত। সেই কলেজ আমলের বন্ধুকে উত্তীর্ণ পঞ্চাশ প্রৌঢ়ের মধ্যে দেখতে পাওয়ার আশা করাই বৃথা। বরং বন্ধুর মুখে ইচ্ছা করলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন সতীকান্ত সান্যাল। অমরেশের সমবয়সী হলেও মাথা জোড়া টাকের জন্যে তাঁকে আরও বয়স্ক দেখায়। তাঁর চেহারায় রুক্ষতা জীর্ণতার ছাপ বরং বেশি করেই পড়েছে। পড়া স্বাভাবিক। অমরেশের মত তাঁর আর্থিক সাফল্য হয়নি। বাঁধা অফিসের কেরানী। কিছুকাল আগে প্রমোশনের ফলে অফিসারের মর্যাদা জুটেছে। এদিকে অবসর নেওয়ার সময়ও তো হয়ে এল।

সতীকান্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নীল পর্দা একটু সরিয়ে একখানি কোমল কচি মুখ উঁকি দিয়েছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই অমরেশ তাকে কাছে ডাকলেন, 'কে? ঝন্টু মহারাজ? এসো এসো। আরে লজ্জা কি এসোই না।'

তাঁর গলার স্বরে শুধু অভয় নয় রীতিমত প্রশ্রয় ফুটে উঠল।

সতীকান্ত দেখলেন ছেলেটি এবার তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে অমরেশের কাছে গিয়ে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আট ন বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ ফুটফুটে ফরসা। পরণে নীল রঙের হাফ প্যান্ট, গায়ে সবুজ জাম্পার। মাথায় তামাটে চুল কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। ছেলেটি অমরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন ফিসফিস করে বলল।

অমরেশ অক্ষমতার ভান করে বললেন, 'অত পারব না। গরীব মানুষ। ট্যাক্সটা একটু কমটম করে ধার্য কর ঝন্টু। আচ্ছা আচ্ছা। আর মুখ ভার করতে হবে না। দিচ্ছি।'

পকেট থেকে একখানি সিকি বার করে অমরেশ ওর হাতে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওকে যেতে দিলেন না। ঝন্টুর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর কোমল গালে গাল ঘষতে লাগলেন। সতীকান্তের মনে হল স্নেহের তীব্রতায় দাঁতে ও

দাঁত ঘষলেন। কয়েক হাত দূরে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে তিনি তাঁর বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলেন। এই মুহূর্তে বাৎসল্যের বন্যায় একেবারে ভেঙে গেছেন অমরেশ। তাঁর সমবয়সী আর একজন পুরুষ যে এ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন সে কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। সতীকান্ত লক্ষ্য করলেন অমরেশের রেখা সঙ্কুল প্রৌঢ় মুখের কাঠিন্য আর নেই, তার বদলে এক স্নেহকোমল আর্দ্রতা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য লোকের চোখে এই একান্ত ব্যক্তিগত স্নেহের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ যে একটু বিসদৃশ লাগতে পারে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই অমরেশের।

তাঁর আদর কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু ছেলেটিই নিমেষের মধ্যে বিব্রত আর পীড়িত হয়ে উঠল। 'উঃ জ্যেঠামুনি, ছাড়ো ছাড়ো। তোমার দাড়ি কী কড়া। আমার গাল জ্বলে গেল।'

অপ্রতিভ অমরেশ তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেটি যেন একই সঙ্গে স্নেহের বন্ধন আর বন্ধন মুক্তির আনন্দ অনুভব করে দুই প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। তারপর এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার অমরেশের লজ্জিত হবার পালা। তিনি হঠাৎ কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সতীকান্ত বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'কে ওটি!' অমরেশ বললেন, 'আমার ভাইপো। বাড়ির সর্বচেয়ে ছোট ছেলে।'

সতীকান্ত বললেন, 'তাই বুঝি সবচেয়ে আদরের। ও তোমার খুব বাধ্য দেখছি।'

অমরেশ বললেন, 'আসলে আমিই খুব বাধ্য।'

তারপর অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্যে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও ধরাও। আসলে আমিই বাধ্য। আমিই আবদ্ধ। দেখ স্নেহ ভালবাসার যারা শুধু প্যাসিভ অবজেক্ট তারাই সুখী। যে অ্যাকটিভ পার্টনার তারই দুঃখের শেষ নেই, বন্ধনের শেষ নেই।'

সতীকান্ত কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

অমরেশ বললেন, 'ও আমাকে আরো ছোটবেলা থেকে জ্যেঠামুনি বলে ডাকে। আসল কথাটা মনি। আর সবাই ওর এই উচ্চারণের ভুলটা শুধরে দেয়। কিন্তু আমি শোধরাতে চাইনে। ওর মুখের ওই মুনি কথাটুকুই আমার দুই কানে অমৃত ঢেলে দেয়। আসলে আমরা কেউ মুনি ঋষি নই। কিন্তু কেউ বললে বড় ভালো লাগে, কেউ উপাধি দিলে বড় ভালো লাগে। আমরা যা নই তাই হতে ভালবাসি। কে জানে কোন কোন মুহূর্তে কি মুহূর্তেরও এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে তা হয়েও যাই।'

সতীকান্ত এবারও কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাঁর দেওয়া সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু উত্তরের প্রয়োজন নেই, মন্তব্যেরও দরকার নেই। নিজের ঝোঁকেই অমরেশ বলে যেতে লাগলেন, 'একদিন হয়তো ওর এই উচ্চারণের ভুল ও শুধরে নেবে। ও যত বড় হবে, নিজেকে তত দূরে সরিয়ে নেবে। যেমন আমার ছেলেমেয়েরা নিয়েছে। তারা এখন ঢের বড় হয়ে গেছে। তাদের আমি আর কাছে পাইনে। হাতের কাছে নয়, বুকের কাছে নয়, মনে হয় মনের কাছেও না।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসলেন অমরেশ, 'এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরী আছে জানো?'

সতীকান্ত এবার একটু কৌতূহল দেখিয়ে বললেন, 'কী থিয়োরী?'

অমরেশ বললেন, 'স্নেহই বলো, ভালবাসাই বলো দেহ ছাড়া কিছুই টেঁকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই দেহের স্বাদ আমরা পাই, দেহের স্বাদ আমরা নিই। দৃষ্টিতে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, বচনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে কিসে পাই জানো? ত্বকে। স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন সব এই ত্বকের কাজ। ভাই বলো, বন্ধু বলো, ছেলে বলো বেশি বয়সে এসে তারা আমাদের এই ত্বককে আর স্পর্শ করে না। এক বিজয়ার দিন ছাড়া বয়স্ক আত্মীয় বন্ধু আত্মজ—কাকেই বা আমি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে পাই? পেতে লজ্জা পাই, তারাও লজ্জা পায়। কিন্তু যদি এই লজ্জা বোধ না থাকত, যদি সংস্কারের বাধা না থাকত তবে হয়তো আমি তাদের বেশি করে পেতাম, বেশি করে দিতে পারতাম। বেশি বয়সে আমাদের আবেগ যে শুকিয়ে আসে তার কারণ আমরা ত্বকের ব্যবহার ভুলে যাই, ত্বকের ব্যবহারে লজ্জা পাই।'

সতীকান্ত একবার সামনের দিকে তাকালেন। কাঁচের আলমারিগুলিতে বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে লেগেছে। সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো আইনের বইগুলি তার মধ্যে ঝকঝক করছে। এই আইনজীবী শক্ত কাঠখোট্টা বিষয়ী বন্ধুর মুখে বহুকাল তিনি এমন আবেগ উষ্ণ কথা শুনতে পাননি, এমন অকপট স্বীকৃতি শোনেন নি, এমন অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন নি। যে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হতে হতে সাধারণ সৌজন্য আর মামলী পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সেই হৃত সৌহৃদ্যকে তিনি যেন নতুন করে ফিরে পেলেন। এই শীতের অপরাহ্নে কিসের এক প্রবল প্রচণ্ড উত্তাপ বরফ গলাতে লাগল। হৃদয়ের আগল খুলে দিয়ে সতীকান্ত বলতে লাগলেন, 'তোমার পরম সৌভাগ্য অমরেশ, তোমার ছেলে-মেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে, আর বড় হয়ে দূরে সরে যেতে পেরেছে। তোমার স্নেহের আলিঙ্গনে তারা বদ্ধ থাকেনি এ তোমার পরম সৌভাগ্য। আমার দুঃখ দুর্ভোগ তোমাকে ভোগ করতে হয়নি। বয়স হলেও বড় না হবার যে কী বিড়ম্বনা—।'

অমরেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোকথা তোমার ছেলেটি কেমন আছে সতী? গোড়ার দিকে একটু অ্যাবনর্ম্যালিটি ছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে বলেই তো শুনেছি। কে যেন বলছিল তোমার ছেলে আজকাল—।'

সতীকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকের কাছেই আমি তাই বলি। বলি ভালো হয়ে গেছে। নিজের লজ্জা আর দুঃখের কথা অন্যকে মিছামিছি জানিয়ে লাভ কি বলো।'

অমরেশ একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমাকেও তো তুমি কিছু জানাও নি। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করেছি তুমি এড়িয়ে গেছ। আমি আর জোর করিনি। তুমি যখন বলতে চাও না, তুমি যখন চেপে যেতেই চাও—'

সতীকান্ত বললেন, 'যে দুঃখের কোন প্রতিকার নেই অমরেশ তার কথা বেশি বলে কী হবে। আজ বলছি শোন। আজ সেই পুরোন দুঃখের সঙ্গে নতুন এক দুর্ভোগ এসে জুটেছে। কিন্তু পুরোন কথাই আগে বলি। তুমি তো সব জানো না। অবশ্য আমি যে তোমার তুলনায় একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম তা তুমি জানো। আগে থেকে আমাদের জানাশোনাও হয়েছিল। প্রথম তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন ছেলে-পুলে হয়নি। আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম, 'ধরো যদি আমাদের ছেলেপুলে কিছু নাই হয়।'

অসীমা বলত, 'বেশ হবে। আমরা যা খুসি তাই করব, যেখানে খুসি যাব, হাতে

পায়ের কোন বন্ধন থাকবে না।'

কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ওর শরীরেই শুধু পরিবর্তন এল না হাবভাব ধরণ-ধারণ সবই বদলে গেল। তখন বুঝতে পারলাম এর আগে ও যা সব বলত তা শুধু মুখেরই কথা। ও যেন শুধু এরই প্রতীক্ষা করছিল, সন্তান ছাড়া ওর আর যেন কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। আমরা তখন গড়পারের একটা বাড়িতে থাকি। বাড়ি বলতে হবে বলেই তাকে বাড়ি বললাম। শুধু পুরোন নয় একেবারে জরাজীর্ণ। কোন শ্রীছাঁদও ছিল না। আমাদের একতলার দুখানি ঘরে ভালো করে আলো বাতাস ঢুকত না। অসীমা যখন এ বাড়িতে প্রথম আসে সে কোন আপত্তি করেনি। সে আমার ক্ষমতার কথা জানে। সে আমার শক্তির সামান্যতাকেই স্বীকার করে নিয়েই স্বয়ম্বরা হয়েছে। অসীমা বলেছিল, 'এই আমার ঢের। এই আমার রাজপ্রাসাদ।'

রাজপ্রাসাদ না হোক মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা তো মিলেছে। এতদিন আমরা দেখা করেছি পার্কে রেস্টুরেন্টে ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে। আমাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। আমি থাকতাম একটা শস্তা মেসে। আর ও থাকত ওর দূর সম্পর্কের মামা বাড়িতে। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সেই আশ্রয় ছাড়বার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ভাঙা ঘরকেই অসীমা মনের মত করে সাজিয়েছিল। ওর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়েছিল এই বাসা যেন আমাদের অল্পদিনের ভাড়াটে বাসা নয়, এখানে আমরা যেন সারা জীবনের মত বসবাস করবার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন থেকে ও অন্য সুর ধরল। কেবলই বলতে লাগল, 'বাসাটা কিন্তু এবার তোমার বদলাতে হবে।' আমি হেসে বলতাম, 'কেন তোমার রাজ অতিথির বুঝি এ প্রাসাদ পছন্দ হবে না?'

অসীমা লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বলত, 'আহা।'

তারপর মুখ তুলে বলত, 'হবেই তো না। এই স্যাঁতসেতে ঘর, আলো নেই বাতাস নেই। এখানে সে এসে কেন থাকবে শুনি।'

আমি বলতাম, 'তাই তো। দেখি চৌরঙ্গীতে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারি কিনা।'

অ্যাডভানসড স্টেজে এসে অসীমার শরীরটা খারাপ যেতে লাগল। প্রায়ই শুয়ে থাকে, মাথা তুলতে পারে না। পেটে যন্ত্রণাও আছে। আমি ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, 'কোন ভয় নেই। প্রথম প্রথম এরকম অনেকেরই হয়।'

অসীমা ওর মামা বাড়িতে যেতে চাইল না। ওর তবু দূর সম্পর্কের এক মামা আছে। দূর দিগন্তেও আমি কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখলাম না যেখানে ওকে নিয়ে তুলতে পারি। তাই সেই বাসাতেই আমার সাধ্যমত ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলাম। ঠিকে ঝি ছিল, তার বদলে রাত দিনের লোক রাখলাম। শুধু অফিসের আয়ে সব খরচ কুলোয় না। টুইশনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে অসীমা ঘর দোর আসবাব পত্রের দিকে পরম মমতাভরা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলল, 'ধরো আমি যদি মরে যাই?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যে বলো। যারা এজন্যে হাসপাতালে যায় তারা বুঝি মরে? না কি আর একটি জীবন নিয়ে ফিরে আসে?'

অসীমা বলল, 'সবাই তো আর তা আসে না। ধরো এমন সঙ্কট যদি আসে দুজনের

বাঁচবার আর কোন সম্ভাবনা নেই, ডাক্তার তোমাকে এসে বললেন, 'যে কোন একটিকে আপনি রাখতে পারেন। হয় মূল না হয় ফুল। আপনি কী রাখবেন বলুন।' আমি তোমাকে বলে যাই তখন কিন্তু তুমি ফুলই রেখো। আমি সেই ফুলের মধ্যেই বেঁচে থাকব। তার মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।'

এসব প্রিমনিশন অসীমার কেন এসেছিল জানিনে। হাসপাতালে কোন অঘটন ঘটল না। তবে ঈজি ডেলিভারি হল না। ডাক্তারকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতে হল। আমি অবশ্য মূল আর ফুল বলা যায় লতা আর ফুল দুইই জীবন্ত পেলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তার জানিয়ে দিলেন লতা আর স্থিতীয়বার পুষ্পিতা হবে না। সেই ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়েই ডাক্তার ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্য অসীমা অনেক পরে জেনেছিল।

মেয়ে নয় ছেলেই হয়েছে। সে ছেলে স্বাস্থ্যবান সুন্দর। রোগাটে হয়নি, ওজনে কম হয়নি। মাকে কষ্ট দিয়ে এসেছে বলে শিশুর মুখে কোন কুণ্ঠা সংকোচের ছাপ নেই। ডাক্তার আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। আমিও স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরলাম। কয়েক মাস পরে বাড়িও বদলালাম। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট অবশ্য নয়, সিমলা স্ট্রীটে দোতলার ওপরে দুখানা ভালো ঘর দেখে আমরা উঠে গেলাম। পুব দক্ষিণে দুটি করে জানলা আছে। আলো হাওয়ার কোন অভাব নেই। স্ত্রীকে বললাম, 'দেখতো রাজপুত্রের উপযুক্ত প্রাসাদ হয়েছে কিনা।'

অসীমা বলল, 'প্রাসাদ তো হল। কিন্তু তুমি চালাবে কী করে। এত খরচ বাড়িয়ে ফেললে। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি বদলাবার কী দরকার ছিল।'

দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'দরকার ছিল বই কি।'

ছোট একটি সংসার তো নয় এক সাম্রাজ্য। আমি আমার সমস্ত শক্তি সেই সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করলাম। পার্টটাইম চাকরি, টুইশন, মাঝে মাঝে কাগজে আর্টিকেল লেখা—উপার্জনের কোন পথই বাকি রাখলাম না। এই বৃহৎ বিশাল পৃথিবীতে আমরা আর কীই বা পারি। একটি ছোট্ট সংসারকে যদি সুন্দর সার্থক করে গড়ে তুলতে পারি তাই যথেষ্ট। আমার দেশকে সমাজকে একটি সুস্থ সবল, সুশিক্ষিত নাগরিক যদি আমি দিয়ে যেতে পারি সেই আমার শ্রেষ্ঠ দান। অন্যের ক্ষতি না করে কোন অসৎপথে না গিয়ে কোন ছলনা বঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে তুমি যদি একটি সৎ সমর্থ উত্তর পুরুষ রেখে যেতে পার সে তোমার কম পৌরুষের কথা নয়।

পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইনে। কারণ আমার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য স্থির আছে। যত শ্রান্ত হয়েই আমি ঘরে ফিরি বাচ্চুকে দেখলে আমার যেন কোন আর অবসাদ থাকে না। বহুকাল আমি খেলাধুলো ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নতুন খেলার উৎসাহ আর বস্তু পেয়ে গেছি। আমি ওকে নিয়ে খেলি, আদর করি, কথা শেখাই। অসীমা অভিমানের ভান করে বলে, 'আমার চেয়ে ছেলেই তোমার বেশি আপন হল দেখছি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। এখন আর আমাকে দিয়ে তোমার দরকার নেই।'

বাচ্চু বড় হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ির আর সব ভাড়াটের ঘরেও ওর খুব আদর। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু এমন লাভলি চাইল্ড আর কারো ঘরে নেই।

হঠাৎ অসীমা একদিন আমাকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদের বাচ্চুর কী হল বল দেখি।'

'কী হল।'

'ওর বয়সী সব ছেলেমেয়ে হাঁটছে, সারা বাড়ি ভরে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু ও হাঁটতেও

পারছে না, কথাও বলতে পারছে না।'

আমি বললাম, 'বোধ হয় একটু দেরিতে হবে। ওর বাবা হাঁটতে শিখেছিল চার বছরে। আর ওর মার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শেখেনি।'

অসীমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা তামাসা রাখো। চলো ওকে আমরা ভালো কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। রকম সকম আমার যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে।'

গেলাম ওকে নিয়ে স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ভরসা দিয়ে বললেন, 'না, আপনার ছেলে খোঁড়া হবে না। বোবাও হবে না। দেখছেন না ও সব শুনতে পাচ্ছে। কালা নয়।'

পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চু হাঁটতেও পারল, কথা বলতেও পারল। ওকে আমরা কাছাকাছি ভালো একটা স্কুল দেখে ভর্তি করে দিলাম। ফার্স্ট সেকেণ্ড না হলেও ও মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেই ক্লাস টু পর্যন্ত উঠল। তারপর আর পারল না। দু দুবার ফেল করল। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বোকা, জড়বুদ্ধি ছেলে। লজ্জায় দুঃখে আর বাঁচিনে। হেডমাস্টার বললেন, 'আসলে ওর কোন দোষ নেই। ও বুদ্ধিতেই বেড় পায় না। আপনারা ওকে স্পেশালিস্ট দেখান। মনে হয় গোড়া থেকে ভালো করে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।'

ছুটে গেলাম আর এক স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি বাচ্চুর মার সামনে কিছু বললেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ একেবারে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েনসি। জন্মগত। ব্রেণের গ্রোথ একেবারে চেকড হয়ে গেছে। আর বাড়বে না। যদি বা বাড়ে খুবই আস্তে আস্তে বাড়বে।'

অসীমাকে আমি তখন আর কিছু বললাম না। কিন্তু পরে সবই খুলে বললাম। সুখের আশায় এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। দুঃখ দুর্ভোগও একসঙ্গেই ভুগব। লুকিয়ে লাভ কি।

ওর চিকিৎসার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সঞ্চয় তো কিছু ছিল না। ধার দেনা করতে লাগলাম। স্ত্রীকে দুচারখানা গয়না যা দিয়েছিলাম গেল। ঘরে দুটি একটি দামি আসবাবপত্র যা ছিল, রইল না। তবু যা চাইলাম তা আর হল কই। যে যাঁর নাম করল তাঁর কাছেই গেলাম। স্পেশালিস্ট, ফিজিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট সকলের কাছে ছুটোছুটি করলাম। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হল, শয়ে শয়ে টাকা ব্যয় হল; কিন্তু আর কিছুই হল না। ডাক্তাররা আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'ও ঠিক ইডিয়ট নয়, তবে—।'

তবে যে কী তার অনেক বৈজ্ঞানিক টার্ম আছে, ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু কোন প্রতিষেধক নেই। এই জড়বুদ্ধি ছেলেটির জড়তা যে কবে ঘুচবে কিসে ঘুচবে তা তাঁরা বলতে পারলেন না। আমরা বুঝতে পারলাম কোনদিনই ঘুচবে না।

আশ্চর্য, অসীমা এই দুর্ভাগ্যকে সহজেই মেনে নিল। ছেলের আদর যত্ন যেমন করত তেমনি করতে লাগল। যেন তার ছেলে আরো পাঁচজনের ছেলের মতই সুস্থ, স্বাভাবিক, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। কিন্তু আমি তা পারলাম না। দুর্বল সন্তানের ওপর মায়ের নাকি সবচেয়ে বেশি স্নেহ থাকে কিন্তু বাপের তেমন অবিমিশ্র স্নেহ

থাকতে পারে না। ছেলের দৌর্বল্যের মধ্যে বাপ নিজের বিকৃত প্রতিকৃতিকে দেখে, নিজের পঙ্গুতা অক্ষমতা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়।

আমি যে আমার ছেলেকে মারধোর করি তা নয়, কোনদিনই করি নি। কিন্তু তেমন মমতাও বোধ করি নি। বরং এক নির্মম ঔদাসীন্য আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অসীমা ওকে যেমন শাসন করে তেমনি আদরও করে, জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। উনিশ উৎরে বিশে পা দিয়েছে বাচ্চু। বয়সে সে যুবক, আকৃতিতেও তো তাই। গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেছে। তবু ওর মা ওকে শিশুর মতই আদর করে। ওর মনের বয়স সাত আট বছরের বেশি বাড়েনি। ওর খেলাধুলো চালচলন সব বালকের মত। সাত আট বছরের ছেলেমেয়েরাই ওর সঙ্গী, তাদের সঙ্গে ও পুতুল খেলে, ছুটোছুটি করে। পড়াশুনোও ওই বয়সী ছেলেদের মত। অনেকদিন আগেই আমি ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি, প্রাইভেট টিউটরও ছাড়িয়ে দিয়েছি। কী হবে আর অর্থব্যয় করে।

কিন্তু আমি দূরে সরে থাকতে চাইলে কী হবে বাচ্চু আমাকে দূরে থাকতে দেয় না। আমাকে দেখলেই আমার গায়ের ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যেমন তোমার ভাইপোর গালে গাল ঘষাছিলে, তেমনি ওর দাড়িওয়ালা গাল আমার গালের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে আদর করে। অবশ্য কাঁচ দাড়ি তবু দাড়িই তো। আমার সর্বাঙ্গ অস্বস্তিতে ভরে যায়। ঘৃণা, লজ্জা, অসহায়তার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যেতে থাকি। আমি ওকে দুহাতে দূরে সরিয়ে দিই। আমি ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে যতদূর পারি চলে যাই। তুমি ত্বকের ব্যবহারের কথা বলছিলে অমরেশ। শুধু ত্বকের কোন দাম নেই। যেমন শুধু দৃষ্টি মানে শূন্য দৃষ্টি, সুধাভরা দৃষ্টি নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনঃপূত করা চাই তবেই সব জীবন্ত হয়; নইলে মৃত। শুধু ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মিলনে আমরা কী পাই। প্রায় কিছুই নয়। সেই সাময়িক সংলগ্নতার স্বাদ কি আমরা জীবন ভরে মনে রাখতে পারি? তাও না। তবু তুমি যা বলেছ এই ত্বকের জন্যেই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমরা সবাই মাংসাশী। কাঁচা মাংস, নিত্য নতুন মাংস আমাদের লুব্ধ করে; পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে নতুন মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এই জন্যেই কি পৃথিবীর নাম মেদিনী? সে মনোময়ী নয়, শুধু মেদময়ী?

অসীমার গুণ আছে, মনের বলও আছে। জড়বুদ্ধি ছেলের শোকে সে নিজে জড় হয়ে বসে রইল না। শুধু ঘর সংসারের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখল না। নিজের চেষ্টায় ঘরে বসে বসে পড়াশুনো করে ও ম্যাট্রিকুলেশন, আই.এ. তারপর বি.এ. পাশ করল। নিজেই চেষ্টা চরিত্র করে পাড়ার হাই স্কুলে একটি টিচারিও নিল। যারা জড়বুদ্ধি নয়, সুস্থ-স্বাভাবিক তীক্ষ্ণধী, সেই সব মেয়েকে পড়িয়ে ওর আনন্দ। নিজের কাজে খানিকটা সুখ্যাতিও অসীমা পেল।

আর আমি কী করলাম জানো? অফিসের চাকরি ছাড়া আমার একমাত্র কাজ হল জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পড়াশুনো, তথ্য সংগ্রহ। কোথায় কোন বইতে ওদের সম্বন্ধে কী লেখা আছে, কোন সাহেব কী অভিমত দিয়েছেন আমি তাই পড়ি তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। একবার একটি বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়লাম এসব ছেলেমেয়েকে ওখানকার এক গভর্ণর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও নাকি করেছিলেন। কারণ যারা যোগ্য, সুস্থ সবল পৃথিবীতে শুধু তাদেরই জায়গা থাকা উচিত। যারা জড় বংশ জড়িয়ে তারা শুধু জড়তারই বিস্তার করবে।

অসীমাকে একথা বলায় সে আমার হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কি বাপ না জহ্লাদ?' আমি বললাম, 'আমার ওপর কেন রাগ করছ? আমি তো আর ওকথা বলিনি। যিনি বলেছেন, সেই গভর্ণরকে তুমি ফাঁসী দাও।' অসীমা তারপর দুদিন আমার সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

আমি যে সত্যিই জহ্লাদ নই ছেলের জন্যে খেলনা এনে দিয়ে, খাবার এনে দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি তার প্রমাণ দিলাম।

পাড়াপড়শীদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হল, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল আর আমি যুবকবেশী এক শিশুকে আঁকড়ে রইলাম।

দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বই লিখতে জানিনে, ছবি আঁকতে জানিনে, কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনে, মরবার পর যা আমাদের চিহ্ন ধরে রাখবে অন্তত কিছুদিনের জন্যে কিছু লোকের মনে রাখলেও রাখবে। আমরা বাঁচতে পারি শুধু আমাদের সন্তানের মধ্যে। সেই সন্তান যত কৃতী হয়, সার্থক হয় আমাদের মনুমেণ্ট গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় আত্মপ্রসাদ এই স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমার বেলায় অন্যরকম হল। সন্তান আমাদের স্মৃতিসৌধ নয়, শুধু কবরের গহ্বর।

বাচ্চু বুদ্ধিতেই জড়, কিন্তু রুস্তুর মত জড়পিণ্ড নয়। ওর মন আছে, হৃদয় আছে। প্রাণোচ্ছল, চঞ্চল বালক। ও যদি আকারে না বাড়ত তা হলে হয়তো ওকে আমি ভালবাসতে পারতাম। আমি না বাসলেও ও কিন্তু ভালবাসে। প্রচণ্ড আবেগ দিয়েই ভালবাসে। ওর মাকে ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে, আমার বয়সী যাদের ও কাকা বলে ডাকে তাদের পরম আত্মীয় বলে মনে করে। বুদ্ধির সঙ্গে কোথায় যেন আবেগের বিরোধিতা আছে। যেখানে আবেগের আধিক্য সেখানেই বুদ্ধির ক্ষীণতা। ওর বুদ্ধি নেই বলেই বোধ হয় আবেগের পাত্র এমন কানায় কানায় ভরা।

কিছুদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম এই ধরনের ছেলেদের সেকস্ ইমপালস বাড়ছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় যৌনবোধ যদি স্বাভাবিকভাবে আসে তাতে সুফল ফলতে পারে।

আমি আমার স্ত্রীর কাছে বাচ্চুর যৌনচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

অসীমা তো লজ্জায় লাল। ওতো জানে না যা দোষ তাও কখনো কখনো গুণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে নিরাশ করল। বাচ্চুর ওসব কিছু হয় না। আসলে মনের যৌবনই যৌবন। সেই মনোরাজ্যে ও বালক মাত্র। সেখানে ও আজও যুবরাজ নয়। তবু আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম।

সেদিন বছরের শেষ বলে আমি ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বাড়ি বসে আছি। অসীমা গেছে স্কুলে। আর বাচ্চু ঘরের মধ্যে বসে পীঁজবোর্ড দিয়ে এক ঘর বানাচ্ছে। শিশুর খেলাঘর।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স আর কত হবে। আঠের কি উনিশ। আমি ওকে চিনি। আমাদের পাশের বাড়ির সনতবাবুর ছোট শালী রেবা। দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

রেবা আমাদের দেখে ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একখানা গল্পের বই নিতে এসেছিলাম। মাসীমা কোথায়?'

অসীমাকে ও মাসীমা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'সে তো স্কুলে গেছে। এসো, ভিতরে এসো।'

রেবা ঘরে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে এক বৃহৎ শিশুর খেলা দেখতে লাগল। মেঝেয় বসে বাচ্চু পীজবোর্ড দিয়ে নতুন ঘর বাঁধছে।

আমি ওকে সচেতন করবার জন্যে বললাম, 'বাচ্চু কে এসেছে দেখতো।'

বাচ্চু মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে একটু ফিক করে হেসে বলল, 'জানি। নতুন মা।' তারপর ফের সে তার ঘর তৈরী খেলায় মন দিল।

মুহূর্তের জন্যে সেই অষ্টাদশী তন্বী, রূপবতী মেয়েটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। তার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। নারীর এই লজ্জায় এই শোভন যৌবনশ্রী আমি যেন এই প্রথম দেখলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল বাচ্চুর মত আমারও গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেছে। বয়সে আমি বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়; মন আমার বাইশ বছরের আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

রেবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে হয় ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার তো পালাবার জায়গা নেই। পলাতককে ধরাই আমার একমাত্র কাজ। রেবা দুদিন বাদেই তার দিদির বাড়ি থেকে চলে গেছে। আর আমি মনে মনে আজও সেই শরীরিনী হরিণীর পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।' সতীকান্তবাবু থামলেন।

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল।

অমরেশ আলো জ্বাললেন না, কোন কথা বললেন না। নিঃশব্দে বন্ধুর হাতে শুধু আর একটি সিগারেট গুঁজে দিলেন।

উপন্যাসের কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।' তাঁর সে-লেখাটি "লেখকের কথা" নামে একখানি বইয়ের মধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) ছাপা হয়েছে। নিজের বক্তব্য আরো পরিস্ফুট করে তিনি বলেছিলেন,—'খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ঐ একই কথা। তবে, তিনি তাঁর কথা তাঁর নিজের মতন করেই বলেছেন। তিনিও অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে থাকেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অভিজ্ঞতার মানুষ বলতে আপত্তি হবার কথা নয়। "দেবযান"-এর মতন অলৌকিক কাহিনীর ভূমিকা হিসেবে, জীবের মরণোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি "শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ," "ভগবদ্‌গীতা," শ্রীঅরবিন্দের "দি লাইফ ডিভাইন" এবং বার্গস'র বচন উল্লেখ করে মরণের পরবর্তী অভিজ্ঞতার ওপরেই জোর দিয়ে গেছেন। অন্যের কাছে সে-সব প্রসঙ্গ যতোই 'আষাঢ়ে গল্প' মনে হোক্ না কেন, "দেবযান"-এর লেখকের কাছে যতীন এবং পুষ্পের পারত্রিক আলাপ-আলোচনা এবং সে-জগতের যাবতীয় আচরণের উল্লেখ যে সত্যিই অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, তাতে সন্দেহ হবার কথা নয়।

তবে, আসল কথা বোধ হয় এই যে, জগতের যে-কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর লেখকের অভিজ্ঞতা ঠিক এক জিনিস নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন সম্বন্ধে মানুষ যে-যে বোধ বা ধারণা বা সুখ-দুঃখের যে-যে অনুভূতি পেয়ে থাকে, সাহিত্যে সেই সব অনুভূতিই নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে আমাদের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। বনফুল-এর ক্ষেত্রে এই অনুভূতি যে-পরিমাণে মৌলিক এবং বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে হয়তো সে-পরিমাণে নয়! তারাশঙ্কর তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই বাস্তবানুগামী,—মাঝে-মাঝে ভাবালুতাময়, উচ্ছ্বাসপ্রবণ! বনফুল সেই একই কারণে—অর্থাৎ তাঁর অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যবশেই অধিকাংশক্ষেত্রেই চমকপ্রদ,—ঠিক রোমাঞ্চকর না হলেও উত্তেজনাজনক—এবং বাস্তব-অতিশায়ী! আসল কথা, এ'দের অনুভূতি ঠিক এক ধরনের নয়। কোনো একজনের অভিজ্ঞতাই আর-একজনের অনুভূতির নকল হতে পারে না। তের শ' তেষট্টি সালে প্রথম প্রকাশিত—এবং ঐ বছরেই গ্রন্থাকারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে পুনঃপ্রকাশিত বনফুলের "ভুবন সোম" বইখানিতে অনিলবাবু বা সখীচাঁদ বা ভুবন সোম, এ'রা কেউ-ই অবাস্তব নন,—কিন্তু সেখানে এ'রা—এবং এ'রা ছাড়া ভুট্টা, ভাগিয়া, চতুর্ভুজ গোপ,—তার মেয়ে বিদিয়া ইত্যাদি সকলে মিলে যে ভ্রমণ-কাহিনীটি সুরসাল করে তুলেছেন, সে-কাহিনী কেমন যেন স্বপ্নের মতন সুন্দর এবং অবিশ্বাস্য মনে হয়! তার আগের বছর,—তের শ' বাষট্টিতে বনফুলের "নিরঞ্জনা" বেরিয়েছিল। সে অবিশ্যি আনাতোল ফ্রাঁসের *Thais* অবলম্বনে লেখা। কিন্তু ২৪-১-৫৫

তারিখে ভাগলপুরে বসে, ছোটো একটি 'নিবেদন'-এর মধ্যে,—বনফুল তাঁর সেই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।' অর্থাৎ—উপন্যাসে লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এবং নিজের দেশ-কাল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সজাগ ভাবটা আমাদের পরিচিত ব্যাপার। উপন্যাসে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ রক্ষা করবার দায়িত্ব যে আবশ্যিক বলেই গণ্য, সে-কথা সমালোচক-সমাজেও বহুশ্রুত ব্যাপার। ইংরেজিতে গত শতকের আগের শতকে ডিফো, রিচার্ডসন এবং ফীল্ডিং-এর কলমে প্রথম যখন উপন্যাস দেখা দেয়, তখন থেকেই এই 'বাস্তবতার' আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকদের সচেতন থাকতে দেখা গেছে। ফ্রান্সে রিয়্যালিজ্‌মের চর্চা হয়েছিল বিশেষ-ভাবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডুরাণ্টির (Duranty) সম্পাদনায় সেখানে *Realisme* নামে এক পত্রিকা ছাপা হয়। কোনো কোনো আলোচকের মতে পশ্চিমে দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক 'রিয়্যালিজ্‌ম্‌'-এর সূচনা ধরা হয় ডেকার্টে এবং লক্‌-এর আমল থেকে। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে, টমাস রীড্‌-ই নাকি সাহিত্যে 'বাস্তব' আদর্শের কথা প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন। বহির্জগৎ যে মায়া নয়, মোহ নয়,—তা' যে সত্য,—এবং ইন্দ্রিয়গোচর এই বহির্জগতের ধারণা যে সত্যেরই প্রতিফলন বা প্রক্ষেপ, সে-সব তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কাজে লাগবে না। উপন্যাসে জগৎ-সম্বন্ধে লেখকদের ব্যক্তিগত ধারণা প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে, এই কথাটাই আসল কথা। এবং 'বাস্তবতা'র নামে আমাদের লেখকরা এই সব সম্বন্ধে তাঁদের নিজের নিজের রুচি-অরুচির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে এইটুকুই কেবল ধর্তব্য!

কিন্তু মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ কি কি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে সে-কথার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি শুধু এই বলে তাঁর সে-প্রবন্ধটি শেষ করেছিলেন যে—'উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।'

সম্প্রতি ভারত-সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত *Cultural Forum* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৫৯) মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে ডঃ হুমায়ুন কবির, মঞ্জেরি এস্‌. ঈশ্বরন্‌, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, মুরিয়েল ওয়াসি এবং আর. ই. ক্যাভেলিয়ো—এই পাঁচজন আলোচকের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের সামাজিক অবস্থানক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবোধের ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দিয়েছে। আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের সূত্রপাত, সম্প্রসারণ এবং পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গেই উপন্যাসের পরিণতির ইতিহাস জড়িত। পাঠকসমাজে গল্পের চাহিদা হোলো চিরন্তন এবং সর্বকালীন ব্যাপার। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য যে ঠিক কোথায়, অথবা কোন্‌ বিন্দুতে, সে-বিষয়ে কবির সাহেবের নিজের মত এই যে, গল্প হোলো জীবনের মোটামুটি স্থিতিধর্মী রূপায়ণ, আর, উপন্যাস নিঃসন্দেহে তার চলচ্ছিত্র। কিন্তু শুধু চলন-লক্ষণই নয়,—উপন্যাসে এই গতিধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সামগ্রিক ধারণাটাও থাকা দরকার। আবার এও স্বীকার্য যে, কেবল ঘটনাস্রোতের বর্ণনাকেই যথার্থ চলৎ-ধর্মবোধের উদাহরণ বলা ঠিক নয়! চরিত্রের

বিকাশ ঘটিয়ে তোলার মধ্যেই মানব-জীবনের যথার্থ গতিরূপের উপলব্ধি ফুটতে পারে। কবির সাহেব সে-কথাও বলেছেন। সময়ের ধারাবোধ এড়িয়ে বা সৌঁদিকে পূর্ণ অবহিত না থেকেও ছোটো-গল্প লেখা যেতে পারে, কিন্তু কালস্রোতের নিত্য নতুন তরঙ্গের উদ্ভব এবং বিলয় সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক কখনোই উদাসীন থাকতে পারেন না। উপন্যাসের এই সব লক্ষণ বিচারের কথা থেকেই তিনি উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের তুলনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের আরো একটি কথা বলতে পেরেছেন। উপন্যাস আমাদের আধুনিক মহাকাব্য তো বটেই। মহাকাব্যের মতনই ধীরে ধীরে এবং সমগ্রভাবে জীবনবীক্ষার প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসে। কিন্তু মহাকাব্য প্রধানতঃ কেবল ব্যক্তিত্বের দিকেই সজাগ, ব্যক্তির সম্বন্ধেই আগ্রহী। অপর পক্ষে, উপন্যাসে আমাদের এই মনুষ্য-জীবনের উত্থানভূমি এবং নিম্নতল—তার উচ্চশীর্ষ এবং গভীর গুহা-গহ্বর সব-কিছুই গৃহীত হয়। কিছুই উপেক্ষিত হয় না,—কিছুই সরিয়ে রাখা হয় না। এদিক থেকে দেখলে মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তার যে আরো বেশি, সে-কথা বলতেই হয়। আবার গতি এবং আয়তনের বিষয়েও বলবার কথা আছে। গতি তো আদ্যন্ত সমান নাও হতে পারে, আয়তনের ব্যাপ্তির মধ্যেও তো বিভিন্ন অংশের আঁটসাঁট সংহতি না থাকতেও পারে! ঔপন্যাসিককে তাই তাঁর রচনার সর্বাংশের মধ্যে আবশ্যিক অন্বয়ের কথা ভাবতে হয়। উপন্যাসের শিল্পরূপ এবং গঠনকলা এই অন্বয়চিন্ততাতেই আশ্রিত। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতার মালমশলার ওপরেই তাঁর রচনার গঠন এবং অন্বয়ের ধ্যানটিকে রূপ দিয়ে থাকেন। এবং কোনো উপন্যাস সত্যিই মহৎ হোলো কি হোলো না, সে-বিষয়ে বিচার করতে হলে পাঠক দেখেন লেখকের উদ্দেশ্যটা কী ছিল এবং তা কতোদূর-ই বা ফুটেছে, অথবা, যে মাল-মশলা তাঁর সেই বিশেষ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রকৃতিটা কী রকম।[১] সমস্ত শিল্পীই রচনার মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত হতে দিয়ে থাকেন। এই ব্যক্তিত্বই এক-এক উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা দেয়। তবে উদ্দেশ্য যদি খুবই স্পষ্ট, খুবই দৃশ্য—অর্থাৎ খুবই সোজাসুজি চোখে পড়বার মতন ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টি আশানুরূপ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। সে বরং প্রচার বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের জীবন-সত্তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যের সামগ্রিক ধারণাটাই, তাঁর মতে, উপন্যাসের আসল কথা। শিল্পরূপের অল্প-বিস্তর ত্রুটি ঘটলেও তা উপেক্ষা করা যেতে পারে,—যদি, এই সামগ্রিক ধারণার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না ঘটে। ডস্টয়েভস্‌কির উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই তো রূপগঠনে শৈথিল্য ঘটেছে,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিবিড় উপলব্ধির গুণেই সে-সব লেখা সমাদৃত হতে বাধেনি। অন্যদিকে, টলস্টয়ের "যুদ্ধ ও শান্তি"র মধ্যে যে ঐশ্বরিক অনাসক্ত দৃষ্টি এবং যে শুচি-শান্ত উপলব্ধি দেখা গেছে, সে কি কখনো ভোলা যায়? ভিক্টর হুগো বা বালজাকের মধ্যে চরিত্র রূপায়ণে হয়তো কিছু কিছু দুর্বলতার নমুনা আছে, কিন্তু যে পরম হৃদয়াবেগ দিয়ে,—যে গভীর সততা রক্ষা করে, তাঁরা এই মানব-জীবনের বিচিত্রতা উপলব্ধি করেছেন, তাকে কি তুচ্ছ বলা চলে? ডঃ কবির এই সূত্রেই রবীন্দ্র-নাথের "গোরা"-র নাম করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র "গোরা"-ই

[১] ডঃ কবির বলেছেন: 'The novelist imposes form and structure on the mass of experiences that come to him and where the form and the content fuse into a unity we have a great work of art. It reflects reality as refracted through the novelist's personality and this is what has led people to judge the greatness of a novel either by reference to the inner purpose of the novelist or the nature of the content on which he has worked.'

বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যের মান অনুসারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত হতে পারে। এবং "গোরা"-র এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি যে সত্যিই সেখানকার চরিত্র-রূপায়ণের দক্ষতায় এবং তার আয়তনের বিশালতাতে আশ্রিত, তিনি সে-কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আরো সাম্প্রতিক উপন্যাসের কথায় এগিয়ে এসে তিনি বরিস পাস্তারনেকের "ডক্টর জিভাগো"-র কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিশেষ একটি মানুষ তার দুর্বোধ্য, জটিল, নির্মম এবং বিস্তৃত পারিপার্শ্বিকতার জালে জড়িয়ে পড়ে, প্রতিবেশের চাপে কতো যে কষ্ট পেতে পারে, এ-উপন্যাসে ব্যক্তিমনের সেই গভীর দুঃখানুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, সমগ্রতার দিকে এখানে ততোটা নজর নেই, যতোটা আছে পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। "ডক্টর জিভাগো"-কে তাই তিনি 'কবির লেখা উপন্যাস'—পর্যায়ে ফেলেছেন। তাতে আশ্চর্য কিছু কিছু প্রস্তরচিত্রের মনোহর বর্ণাঢ্যতাই যেন ফুটেছে। সেই রম্যতা কিন্তু সমগ্রতা নয়। সমগ্রতা আসলে একরকম মানসিক ক্ষমতা। বহু বস্তুর সমাবেশকেই সমগ্রতা বলে না!

শ্রী মঞ্জেরি ঈশ্বরন্ আবার, অভিধান খুলে 'নভেল' কথাটির মানে দেখিয়ে দিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি নানাবিধ সংজ্ঞা এবং বর্ণনা তুলে তুলে উপন্যাসের বহুবিধ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ইংরেজিতে ড্যানিয়েল ডিফো থেকে শুরু করে জেম্‌স্ জয়েস অবধি সুবিপুল যে উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে এসেছে, সেই ধারার বিচিত্রতা মানতেই হয়! ই. এম্. ফর্স্টার খুবই সোজাসুজিভাবে উপন্যাসে গল্পরসের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। অধিকাংশ সাম্প্রতিক উপন্যাসে সাম্প্রতিক ব্যাপারেরই বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। ফলে, সে-সব ক্ষেত্রে চিরকালের কথা সত্যিই চাপা পড়ে যায়! এবং মানব-জীবনের চিরন্তন সত্য যেখানে অনুপস্থিত, সে-রকম উপন্যাস আর যাই হোক, কালজয়ী যে নয়, তাতে সন্দেহ কিসের? ঈশ্বরন্ মনে করেন যে, উপন্যাসে কোনো-রকম বলপ্রয়োগই ভালো নয়,—যৌন-প্রসঙ্গ, কাঁদুনে কায়দা, মনস্তত্ত্বক-টাঁকত রীতি এ-সবের কিছুই বাঞ্ছিত নয়! তবে হ্যাঁ, সাধারণ পাঠকের কাছে উপন্যাস যে কতকটা শিক্ষাপ্রদ জিনিস, তাতেও সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসিদ্ধ শিল্পী বেন এ্যামস্ উইলিয়াম্‌স্-এর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে ঈশ্বরন্ এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাস মাত্রেই কিছুটা ইতিহাস হতে বাধ্য। পরিশেষে তিনিও সেই বরিস পাস্তারনেকের প্রসঙ্গে এসেছেন। ইতিহাসের স্বরূপ কী? "ডক্টর জিভাগো" বইখানিতে একজন সেই প্রশ্নই তুলেছেন বটে। কিন্তু প্রশ্নটা যতো স্পষ্ট, উত্তরটা ঠিক ততো নয়। ঈশ্বরন্ বলেছেন, যে-কোনো যুগের কথাই ভাবা যাক না কেন, সে-যুগের উপন্যাসে সেই বিশেষ যুগের মানব-চৈতন্যের সর্বাধিক স্ফূর্তির কথাটাই ধরা পড়ে থাকে!

অতঃপর অধ্যাপক তারকনাথ সেনের কথা। আদিতেই তিনি উপন্যাস-পাত্রটির ধারণ-ক্ষমতার কথা বলেছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের সবটাই অথবা যে-কোনোটাই ঔপন্যাসিকের অবলম্বন হতে বাধা নেই। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি সব পক্ষই জায়গা পেতে পারেন উপন্যাসে। সাহিত্যের প্রকার হিসেবে এতোবড়ো পাত্র বুঝি আর কোথাও নেই। মহাকাব্যের প্রসার,—নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত এবং উদ্বেগ,—গীতিকবিতার আবেগের টান—এবং তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের মননগুণ, উপন্যাসে সবই যেন জায়গা পেতে পারে। মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই কী যে আশ্চর্য গৌরব এবং মহিমা,—কী আশ্চর্য তার উৎসাহে বা আগ্রহগুণ,—মানুষ কী যে এক প্রহেলিকা—উপন্যাসে তার এই সত্যস্বরূপের সর্ববৈচিত্র্যেরই

অভিব্যক্তি সম্ভব এবং সাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের কথা-সূত্রে তারকনাথ সেন একথাও বলেছেন যে, এলিজাবেথের যুগে ইংরেজ তার নাটকে এই রকম বৃহৎ পাত্র-ধর্ম বা আধারগুণ ফোটাতে পেরেছিল। কিন্তু একালে একমাত্র উপন্যাসই সে-কাজ করতে পারে।

বৃহৎ পরিসীমা, বৃহৎ পরিসর,—ব্যাপ্তি এবং সমগ্রতা,—তাঁর মতে, এই সব গুণই হোলো মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ।[১] এই সমগ্রতা-বোধ যেখানে নেই, সেখানে সত্যিকার মহৎ উপন্যাস দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। টুর্গেনিভের *A Lear of the Steppes* উপন্যাস নয়, কনরাডের "টাইফুন"ও উপন্যাস নয়। অর্থাৎ সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কেবল তিনিই লিখতে পারেন যাঁর মনের ধারণাশক্তিতে অথবা কল্পনার ব্যাপ্তিতে কোথাও কোনো সংকোচ ঘটেনি!

কিন্তু সে-রকম মন কি চাইলেই পাওয়া যায়? সার্থক বড়ো উপন্যাস লেখবার আশ্বা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বল্পশক্তি, সাধারণ লেখক যখন এ-রকম অসাধারণ কিছু একটা করে তুলতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর। অধ্যাপক সেনের কথায়— 'Attempting to write a great novel without a great mind to inspire and organise the attempt can only result in an unsynthesised *pot-pourri*, and the novelist who makes the attempt looks like a man to whom you have given a great bag to fill with things of value and who brings it back half empty or filled with gimcrack.'

সুঠাম গল্পের জোরে,—কিংবা নতুন তথ্যের সমারোহে,—কিংবা রীতির নতুন নতুন কায়দায়—এ সবের কোনো কিছুতেই একখানা মহৎ উপন্যাস লিখে ফেলা সম্ভব নয়। অধ্যাপক সেন তো 'চৈতন্যস্রোত' উদ্ঘাটনের আধুনিক 'ফ্যাশান' সম্বন্ধে খুবই সন্দেহবাদী। কারণ, তাঁর মতে, মানুষের মনের ধারা যে বড়োই স্বেচ্ছাবিচরণে অভ্যস্ত। তবে, লেখক তাঁর নিজের অভিপ্রায়ের খাতে ফেলে সে-ধারাকে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালাতে পারেন বটে। এবং যা ছিল আদিঅন্তবর্জিত নিরন্তর 'স্রোত', লেখকের উদ্দেশ্যবোধের চাপে পড়ে সেটা অচিরেই এক কৃত্রিম 'খাল' হয়ে দেখা দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়! অধ্যাপক সেন তাই বলেছেন, উপন্যাস আর যাই হোক, সেটাকে কোনোমতেই একটা খাল মাত্র বলা চলে না।

গ্রীসে আলেকজান্ডারের বিচিত্র বিজয়-অভিযানের অব্যবহিত পরবর্তী যে 'হেলেনিস্টিক' আমল গেছে,—সে-পর্বে যেমন 'এপিক' আর 'ট্র্যাজেডি'র অবসান ঘটে 'এপিলিয়ন' এবং 'প্যাস্টোরাল ইডিল,'—'এপিগ্রাম' এবং 'এলিজি'র প্রাচুর্য শুরু হয়েছিল,—তাঁর মতে, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই ভাবই দেখা যাচ্ছে। ক্যালিমেকাসের Aitia থেকে অ্যাপলোর পরামর্শ স্মরণ করেছেন তিনি—বলেছেন—'Keep your muse thin'—'Mela biblion mela kakon'—'বড়ো বই মানে বড়ো বোঝা'!—

এ যুগে বৃহদায়তন উপন্যাস অচল। তবু যে গল্‌স্ওয়ার্দির "দি ফরসাইট সাগা" বা রোমাঁ রোঁলার "জাঁ ক্রিস্তফ্" বা জুলে রোমাঁর "মেন অব গুড উইল"-এর মতন অতিকায় কিছু কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে, তা থেকে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তারই সুযোগ পাওয়া যায়।

---

[১] অধ্যাপক সেন বলেছেন : 'Range, breadth and sweep, amplitude and spaciousness, totality of appeal—these, then, are essential to the making of a great novel.'

অধ্যাপক সেন বলেছেন, ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের আমল তো আগেই শেষ হয়েছে। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের যুগই হয়তো ভবিষ্যতে আরো কিছুকাল চলবে। হয়তো ব্যক্তিজীবন থেকে ক্রমশঃ সামগ্রিক জাতি-জীবনের দিকেই ভবিষ্যতের উপন্যাস আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। হয়তো এক লেখকের রচনার পরিবর্তে উপন্যাস হয়ে উঠবে বহু লেখকের সমবায়-অনুশীলনের বিষয়! একথা বলবার সময়ে তিনি বিশেষভাবে যদি কোনো দেশের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে সে হোলো রুশদেশ। কিন্তু সে দেশেও এ রকম রচনা এখনো সত্যিই সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফিরিয়ে তিনি অতঃপর উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনেরোই অগাস্টের আগেকার শতকার্ধের কথা ভেবেছেন। আমাদের সেই অর্ধ-শতকের জাতীয় সংগ্রাম কি সত্যিই একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না?

তাঁর এই প্রশ্নের কথা ভাবতে ভাবতেই তারাশঙ্করের "কালিন্দী", "পঞ্চগ্রাম", "মন্বন্তর", "সন্দীপন পাঠশালা" ইত্যাদি বইয়ের কথা মনে পড়তে পারে। "কালিন্দী" প্রভৃতি বইয়ের পেছনে ঐ ধরনের একটা সংকল্প যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু সংকল্পে যে কাজ হয় না! মহৎ উপন্যাসের জন্যে যা উপযুক্ত, বিধাতার দেওয়া সে-রকম ধারণাশক্তি বাংলা উপন্যাসে সত্যিই আজও চোখে পড়ে না। আমাদের ভালো উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু সত্যিকার মহৎ উপন্যাস কোথায়?

ভবিষ্যতের উপন্যাস সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন পরিশেষে এইচ্. জি. ওয়েল্স্-এর "দি ওয়ার্ল্ড্ অব উইলিয়ম ক্লিসোল্ড্"র নাম করেছেন। সে বইখানিকে তিনি উচ্চ উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত বলেননি বটে, কিন্তু 'আইডিয়া'র উপন্যাস বলতে যা বুঝিয়ে থাকে,—ক্লিসোল্ড্ যে সেই জাতের বই—এবং ভবিষ্যতে সেই জাতের উপন্যাসই যে আরো ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হতে পারে, এই রকম এক সম্ভাবনার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীযুক্তা মুরিয়েল ওয়াসি তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মহৎ উপন্যাসের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে পুনরায় সেই সামগ্রিক ধারণা বা কল্পনাশক্তির কথাই তুলেছেন। তিনিও সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের কথায় "ডক্টর জিভাগো"র নাম করেছেন। আর, শ্রীযুক্ত ক্যাভেলিরো সে-বইয়ের নাম করেছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে এই মন্তব্য যোগ করতে ভোলেন নি যে, সাম্প্রতিক কোনো রচনাকে 'শ্রেষ্ঠ' বলে ফেলাটা হঠকারিতা বলেই গণ্য; কারণ, কোনো বই সত্যিই মহতী সৃষ্টি হয়েছে কি না, সে-বিচার তো বহুকালব্যাপী এক সামাজিক বিচার! উত্তরকালে সে-রচনা সম্বন্ধে পাঠকরা কী ভাববেন, কী বলবেন, সে-সব কথা কি এই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে চূড়ান্তভাবে বলে ফেলা যায়?

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখক এবং পাঠকদের মধ্যে সমুচিত ভাবনা যে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, সাধারণ পাঠক এবং সাধারণ লেখকের কথা আলাদা। তাঁরা মোটামুটি প্রথার ধারক, প্রথারই বাহক। সব দেশে, সব কালে এই প্রথানুগামিতাই জনসাধারণের স্বভাব। এবং এই ব্যাপক জনস্বভাব থেকেই লোকচক্ষুর অগোচরে শিল্পের নতুন নতুন রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেই সূত্র ধরেই এসব কথা বলা গেল।

মহৎ উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে কথা উঠলে শেষ পর্যন্ত জীবন-সমালোচনার শিল্প-গুণের তারতম্যের কথাই ভাবতে হয়। এবং উপন্যাসে জীবন-প্রক্ষেপের বিশ্লেষণে এগিয়ে

গেলে ঘুরে ফিরে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই দেখা দেয়। মনে পড়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠা বা বাস্তবচর্চার ঝোঁক খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার লেখকদের মধ্যে Champfleury-র নাম খুবই পরিচিত। তাঁর আয়ুষ্কাল গেছে ১৮২০ থেকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Realisme* -এর মধ্যে তৎকালীন বস্তুবাদী ভাবাদর্শের প্রতিভূ হিসেবে তাঁর আনুগত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার (১৮২১-৮০) ছিলেন তাঁরই সমকালীন লেখক। ফ্লবেয়ারের জন্মস্থান Rouen। প্যারিতে তিনি আইন-শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা ঘটে। দেশের নানা জায়গাতে তো বটেই,—ফ্রান্সের বাইরেও নানা অঞ্চলে তিনি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মাদাম বোভারী" প্রকাশিত হয়। এই "মাদাম বোভারী"র জন্যে তাঁকে কিছু আইনের তাড়না এবং আদালতের যন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও পরিশেষে তিনি কিন্তু সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইতিহাসে ফ্লবেয়ারকে বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ স্মরণযোগ্য ব্যক্তি বলেই দেখানো হয়ে থাকে। তবে, তাঁর প্রথম দিকের লেখাতে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের মোটেই যে অভাব ছিল না, কেউ কেউ সে-প্রসঙ্গও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বুদ্ধি খাঁটিয়ে বস্তুবাদী সাহিত্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন,—স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুধর্ম তাঁর নাকি স্বভাব নয়—এরকম কথাও বলা হয়ে থাকে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-সূত্রে ক্যাজামিয়াঁ তো ফ্লবেয়ারকে মহান লেখক বলতেও আপত্তি করেননি। তিনি কিন্তু আরো এক কথা বলেছেন। ফলের গাছে পাকা ফলের সহজ সৌন্দর্য যেমন সহজেই আমাদের চোখের তৃপ্তি ঘটিয়ে থাকে, সেরকম সহজ পরিণতির চিহ্ন ফ্লবেয়ারের কোনো লেখাতেই নেই। বহু আয়াস-প্রয়াসে তিনি যে তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ একরকম পরিণতি ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন,—তাঁকে যে অসংখ্য কাটাকুটির যন্ত্রণা উজিয়ে এক-একখানি উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিমার্জনে পৌঁছুতে হয়েছে,—তার নজীর দেখতে হলে তাঁরই নানান চিঠিপত্র খুঁজে দেখা দরকার।

কিন্তু, জীবনের নানা খণ্ড-ঘটনার হুবহু বিবরণ তুলে ধরাটাই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাজ নয়। তাই যদি হোতো, তাহলে এডমণ্ড (১৮২২-১৮৯৬) আর জুলে (১৮৩০-১৮৭০) এই দুই গনকোর্ট্ সহোদরের কলম থেকেই জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হোতো। তাঁরা কিছু পরিমাণে ব্যালজাক-এর এবং কিছু পরিমাণে ফ্লবেয়ার-এর অনুসরণ করেছিলেন। শোনা যায়, এমিল জোলা নিজে এবং তাঁরই সঙ্গে, তখনকার প্রাকৃতবাদী (naturalist) লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই তাঁদের পথ ধরেই তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন! সেকালের জীবন-পরিবেশের খুঁটিনাটি নানা তথ্য,—বহু ছবি, দলিল, চিঠিপত্র, আসবাবপত্রের নমুনা ইত্যাদি সেকালের নানা উপকরণ তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত হতে দিয়েছিলেন। এই ভ্রাতৃযুগলের প্রশংসা করে ক্যাজামিয়াঁ জানিয়েছেন যে, কেবল তথ্য-সংগ্রহের বিপুলতাই এঁদের সামর্থ্যের বিশেষত্ব নয়,—যথার্থ শিল্পীর চোখ ছিল এঁদের। শুধু যে Fontainebleau প্রদেশের আরণ্যসৌন্দর্য বর্ণনাতেই এঁদের মনোযোগ ছিল, তাও নয়। প্যারি নগরীর আশপাশের মফস্বল অঞ্চলও এঁরা বর্ণনা করে গেছেন। সেকালের পক্ষে এ মৌলিকতাও তুচ্ছ নয়।

এই গনকোর্ট-ভ্রাতৃযুগলের যখন বাল্যদশা, সেইসময়ে আলফাঁস দোদের (১৮৪০-১৮৯৭) জন্ম হয়। ফরাসী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সামর্থ্যের কথা সুপরিচিত। ছোটগল্প

এবং উপন্যাস, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। অকৃত্রিম মমতা আর কৌতুক-বোধের সমন্বয়ে তাঁর বাস্তব-দৃষ্টিতে বিশেষ যে গুণটি বর্তেছিল, তারই ফলে, তাঁর লেখাতে ইংরেজ পাঠক-সমাজের চোখে বিশেষভাবে বাঞ্ছিত এবং বিশেষ সমাদরণীয় দুর্লভ 'হিউমার'-এর আভাস দেখা গেছে। ডিকেন্সের সঙ্গে সেইদিক থেকেই তাঁর সমধর্মিতার কথা ভাবা হয়।

দোদের সঙ্গে একই বছরে জন্মেছিলেন এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। ফরাসী সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ বা 'ন্যাচারালিজম্'-এর তখন প্রবল জোয়ারের কাল। জোলার লেখাতে সেই বস্তুবাদ এবং প্রাকৃতবাদের প্রভাব পড়েছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে—রুশ-ফরাসী-ইংরেজি-জার্মান যে-কোনো সাহিত্য-রাষ্ট্রের কথাই ভাবা যাক না কেন, জগতের বাস্তব সত্য আর লেখকদের কল্পনার সৃষ্টি, এই দুইয়ের আনুপাতিক সম্পর্কের কথাটাই বার বার মনে আসে। যিনি যে-ভাবেই কল্পনার কাজ দেখান না কেন,—চরিত্র, ঘটনা, গঠন, সংলাপ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণের সমাবেশে আমাদের এই দুর্বোধ্য জীবন-রহস্যের বিস্তার এবং গভীরতা,—দুটি দিকই ফুটিয়ে তোলা দরকার। তবে, সে-কাজ কোন্ উপায়ে, কী কৌশলে যে সাধ্য, সে-কথা কে বলবে? শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচারবুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই।' অর্থাৎ ঐ পর্যন্ত পাঠকের সীমা! মানিকবাবু যে তাঁর পূর্বোক্ত লেখাটিতে 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন'-এর কথা তুলেছিলেন, সে তো খুবই সংগত কথা। তবে, 'বিজ্ঞান' কথাটার দিকে সমুচিতভাবেই লেখকদের চৈতন্য জাগা দরকার। তের শ' বত্রিশ সালের পৌষের "সবুজপত্রে" সেকালের 'সমসাময়িক সাহিত্য' আলোচনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন, 'সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি।...আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় শরৎচন্দ্র।' নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তৃত অর্থেই সুকুমার সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন। তিনি শিল্পী আর সংস্কারক, এই দুই পৃথক ভূমিকার কথা ধরে, আলোচনা করতে করতে প্রসঙ্গতঃ দেশী-বিদেশী কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকুমারবাবু প্রধানতঃ উপন্যাসের কথাসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই 'মোহিনী শক্তি'র অভাবের ইশারা করেছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ১৩৫৪-র আষাঢ় মাসে ছাপা "বাংলা উপন্যাস" বই-খানিতে তিনি বাংলা উপন্যাসের আদিকাল থেকে শুরু করে বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার এবং শরৎচন্দ্রের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলে, পরিশেষে মাত্র বারো পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারা বর্ণনা

করেছেন। এই আধুনিকতর উপন্যাস-ক্ষেত্রকে তিনি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে 'পূর্ববর্তী ধারাকে সমুদ্রপ্রবেশোন্মুখ নদী বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের উপন্যাসে বিষয়-নির্বাচন, আলোচনা-পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রাক্তন আদর্শ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সাম্প্রতিকতর বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তারই মধ্যে নানান্ বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বহুতর বিচিত্রতার কথা মনে রেখে তিনি নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে কয়েকটি আধুনিক প্রবণতার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। একালের এইসব বিশেষত্বের মধ্যে একটি হোলো 'নিষিদ্ধ ও সমাজ বিগর্হিত প্রেম'-এর দিকে লেখকদের নজর। আগের আমলেও বাংলা উপন্যাসের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসেবে এদিকটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু হাল আমলের লেখকদের কলমে এই প্রসঙ্গই কেমন যেন অন্য মনোভঙ্গির তাড়নায় অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। শ্রীকুমারবাবু এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়—'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙালী-সমাজে অবাঞ্ছিত প্রেমের বিরলত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলিয়াই ইহার আবির্ভাবের পটভূমিকা রচনার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ইহাকে হয় আদর্শলোকের উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্র করিয়াছেন না হয় যে বিপুল, অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও প্রতিবেশ-বৈশিষ্ট্য হইতে ইহার উদ্ভব তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন। ইহার অবৈধ প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার পিছনে আছে উচ্চতর নীতিবোধের সমর্থন, বিদ্রোহের ঝাঁজ, বঞ্চিতের প্রতি ন্যায়-বিচারমূলক সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের অনুপম রসমাধুর্য।' অপর পক্ষে হাল আমলের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এই একই বিষয়ে বিপরীত মনোভাব দেখা গেছে। আবার, তাঁরই কথায়—'প্রথমতঃ ইহারা এইরূপ অবৈধ প্রেমের উদ্ভবকে বাঙালী-সমাজের একটি অতি সুলভ স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব রূপে গ্রহণ করিয়া ইহার সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা কেমন করিয়া প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে জন্মিল, কি বিপুল হৃদয়াবেগের দোলায় আন্দোলিত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিল তাহার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইঁহাদের উপন্যাসে মিলে না।' শ্রীকুমারবাবু এই প্রসঙ্গটি আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। এঁদের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গ-নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন, এঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যাধিত (morbid) অবস্থা সম্বন্ধেও তেমনি,—শ্রীকুমারবাবু খুবই স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। সেটুকুও স্মরণীয় : 'অবিমিশ্র বাস্তববাদই ইঁহাদের প্রধান ধর্ম ও ইঁহাদের অনুসৃত প্রণালীর চূড়ান্ত সমর্থন এইরূপ দাবি ইঁহাদের তরফে করা হয়। কিন্তু আলোচনার মধ্যে যে সবসময় নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবানুসরণের পরিচয় মেলে তাহা মনে হয় না।...কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের প্রথম বয়সের রচনা পড়িলে মনে হয় যে নিছক কুৎসিৎ-প্রীতিই তাঁহাদের বিষয়-নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার ইঁহাদেরই পরবর্তী রচনায় বাস্তবানুগত্য অন্য দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কর্দমের হোলি খেলার পরিবর্তে কাব্যোল্লাবনের জোয়ার আসিয়া বাস্তবতার ভিত্তি মূল পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের আভাস পারিজাতকুসুমসুরভির ন্যায় বাস্তব পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে।' উপন্যাস-লেখকের পক্ষে একথা যতই অপ্রীতিকর হোক্, সত্যের খাতিরে সমালোচকের এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

এ-কালের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে কোনো মহিমা বা কোনো প্রশংসনীয় শক্তির পরিচয় নেই—এ-রকম কথা কোনো সৎ-পাঠকেরই অভিপ্রেত নয়। উনিশ শ' তিরিশ থেকে উনিশ শ' ষাটের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিলেও—অজস্র ভালো

উপন্যাস যে বেরিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের স্মরণীয় উপন্যাস-শিল্পী। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ যে কতকটা প্রতিবেশ-নিরপেক্ষভাবে 'ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে দোলায়িত হৃদয়বৃত্তির ইতিহাস' লিখে গেছেন,—এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে 'সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের স্বাধীনতার বিদ্রোহ' উচ্চারিত হয়েছিল, শ্রীকুমারবাবুর সে-বিশ্লেষণেই বা সন্দেহ কিসের? আর, শতাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী—আমাদের এই সাম্প্রতিকতম বর্তমানে, 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা' যে 'আজ সর্বগ্রাসী অভিভবে জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে' চেপে ধরেছে, সে-কথাও সন্দেহাতীত। ফলে, তাঁরই কথায়—'আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অন্তর্জীর্ণতার জন্যই কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসরণে অক্ষম। হৃদয়াবেগের মধ্যে যাহা তীক্ষ্ণতম অনুভূতি সেই প্রেমও আজ নানা জটিল সমস্যাজালে সমাচ্ছন্ন।'

এই শেষ মন্তব্য বিশেষভাবে সাম্প্রতিকতম বর্তমানের প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। এতে আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে একজনকে ভালো বা অন্যজনকে মন্দ বলবার চেষ্টা নেই। বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক প্রাচুর্য যে সৎ পাঠকের কাছে মোটেই উল্লাসের বিষয় নয়, সেই গূঢ় এবং গুরু কথাটাই এইসূত্রে স্বীকার্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী,—কল-কারখানার শ্রমিক,—কৃষিজীবী গ্রামবাসী,—যাযাবর, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি—যে-কোনো শ্রেণীর কথাই আসুক না কেন,—জীবনের বিস্ময় এবং বাস্তব-জগতের সম্ভাব্যতা কিছুতেই যেন আর মিশতে চাইছে না। শ্রীকুমারবাবু আরো লিখেছেন, 'অতি-আধুনিক উপন্যাসে হাস্যরসিকতার একান্ত অভাব'।

আধুনিক সাহিত্য

কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে এপর্যন্ত অন্ততঃ আটখানি বই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে; তার বেশির ভাগ তাঁর জীবন কথা; তবে তাঁর সাহিত্যেরও নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেবার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ভিন্ন একালের আর কোনো সাহিত্যিক সম্বন্ধে এতগুলো বই বোধহয় লেখা হয়নি। নজরুল তাঁর কালে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন একালে তার ধারণা করাও কঠিন। তেমন উদ্দাম জনপ্রিয়তা যে কিছু-দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হবার পথে দাঁড়াবে এই স্বাভাবিক। নজরুলের জনপ্রিয়তাও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ হ্রাস পেলেও তাঁর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরের প্রেমপ্রীতি আজো যে কম নয় তাঁর সম্বন্ধে পর পর এতগুলো বই সেই সাক্ষাই দিচ্ছে।

তাঁর সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সম্পদ আছে। এর থেকে বোঝা যায় মানুষের চিত্তকে সহজে স্পর্শ করবার শক্তি তাঁর চরিত্রে ও সৃষ্টিতে প্রচুর ছিল। তবে এই সব বইয়ের মধ্যে দুখানিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে—মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিত নজরুল সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথা আর ডক্টর সুশীল-কুমার গুপ্ত লিখিত "নজরুল-চরিতমানস"।

গুপ্ত মহাশয় তাঁর বইখানিতে নজরুল-প্রতিভাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন বৃহত্তর দেশ ও কালের পটে সাজিয়ে। বলা বাহুল্য এটি সার্থক পথে পদচারণা। কিন্তু এপথে বিপদও আছে—পশ্চাৎপট যদি অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত হয় তবে তা মূল ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলতে তেমন সাহায্য নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে তেমন ব্যাপার কিছু ঘটেছে। নজরুলের বিশেষ যোগ তাঁর কালের বাংলা সাহিত্য আর বাংলার ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে—সেই সঙ্গে সমসাময়িক কালের বৃহত্তর জগতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও তাঁর কিছু যোগ ছিল। দূর কালের সাহিত্য, যেমন বৈষ্ণবসাহিত্য ও সুফীসাহিত্য, তারও সঙ্গে তাঁর কিছু যোগ ঘটেছিল; কিন্তু সে-যোগ ইতিহাস-সচেতন আদৌ নয়, বলা যেতে পারে সে-যোগ মরমী। গুপ্ত মহাশয় নজরুল-প্রতিভার এই বিশেষরূপের দিকে পুরোপুরি নজর রাখেননি বলে তাঁর ছবি মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়েছে, তাঁর বাণীও প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণতা লাভ করতে পারেনি। সাহিত্যে পরিমিতি খুব বড় ব্যাপার—শুধু রস-সাহিত্যে নয় আলোচনা-সাহিত্যেও।

কিন্তু এটি মোটের উপর এই বইয়ের অপ্রধান দিক, এর প্রধান দিক হচ্ছে নজরুলের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টির ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দান। সে কাজটি লেখক যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্য যা লাভ করেছেন তা প্রশংসার্হ। এসব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলোচকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি, আর যোগ্যভাবে তা স্বীকারও করেছেন।

নজরুল মানুষটির প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে অনেকখানি সন্দেহহীনতা লেখককে প্রেরণা দিয়েছে এই অপেক্ষাকৃত জটিল কাজটি হাতে নিতে। কারো

কারো এমন ধারণা আছে যে অনুরাগ সমালোচকের জন্য গুণ নয় বরং দোষ, কেননা, সেই অনুরাগ তাঁর বিচারে বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। কথাটা ভাববার মতো। অনুরাগ যে সময় সময় এমন অনর্থ না ঘটায় তা নয়। তবু এইটি এক বড় সত্য যে অনুরাগবিহীন হয়ে কেউ কখনো সমালোচনার ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। সমালোচকের মধ্যে একই সঙ্গে চাই অনুরাগ আর বিচারবোধ এই প্রায় পরস্পরবিরোধী গুণ। গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যে অনুরাগের সম্বল যে আছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারের দিকটাও তাঁতে লক্ষণীয়—নজরুলের সাহিত্য-কৃতি সম্বন্ধে একালে যাঁরা খুব উৎসাহী নন এমন সব সমালোচকের মত উদ্ধৃত করে' অনেকখানি পক্ষপাতহীন হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি চেষ্টা করেছেন, আর মতবাদের অন্ধতার দিকেও তাঁর গতি নয়। এই সব গুণে বইখানি নজরুল সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ হয়েছে।

কিন্তু বিচারের দুর্বলতাও কখনো কখনো তাঁতে লক্ষণীয় হয়েছে সমালোচনা-শাস্ত্রের একটি বড় ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি যে তেমন সজাগ থাকেননি সেজন্য। সেই ত্রুটিটি হচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে দেখার দিকে উক্ত শাস্ত্রের বেশি ঝোঁক। অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে একাজটি কখনো কখনো করতে হয়; কিন্তু সব সময় এ-চেতনা থাকা চাই যে এই বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো কাজটি দুদণ্ডের খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। কোনো মানুষকেই যেমন সোজাসুজি পাপী বা পুণ্যাত্মা বলা যায় না তেমনি কোনো সাহিত্যকারকে সোজাসুজি realist বা idealist, দেহবাদী বা অতীন্দ্রিয়পন্থী এসব বলা যায় না—যাঁরা বলেন তাঁরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনেন অর্থাৎ অসার্থকতার পথে পা বাড়ান। গুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তেমনি বিপদ ডেকে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষিত করেছেন অধ্যাত্মবাদী অতীন্দ্রিয়-পন্থী এইসব বিশেষণ দিয়ে আর তাঁর পরবর্তী সত্যেন দত্ত, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল ও নজরুলকে ফেলেছেন তাঁর বিরুদ্ধ দলে—এঁদের বিশেষিত করেছেন দেহবাদী বাস্তব-বাদী এইসব বিশেষণ দিয়ে যদিও গুপ্ত মহাশয়ের অজানা থাকবার কথা নয় যে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানা ভঙ্গিতে বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার', বাংলার পল্লীর অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তাঁর গল্পগুচ্ছে, আর তাঁর ধর্ম-সাধনায় মানুষ ঈশ্বরেরই মতো মর্যাদা পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের চিন্তা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু স্বতন্ত্র পথ নিয়েছিল, তাই তাঁদের রবীন্দ্র-চিন্তার বিরুদ্ধবাদী ভাবা যেতেও পারে, কিন্তু সত্যেন দত্ত ও নজরুল এমন দাবি আভাসে ইঙ্গিতেও জানাননি, বরং যে মানবিকতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বড় সুর তাই ধ্বনিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে, আর নজরুলের সাম্যবাদ যে মূলত উদার মানবিকতা, তাঁর ঈশ্বরদ্রোহ যে এক ধরনের অভিমান, সে কথা গুপ্ত মহাশয় নিজেও মাঝে মাঝে বলেছেন আর তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটি :

দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু।

এরপর তাঁকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধীদলের একজন কবি রূপে দাঁড় করানোর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। বলা বাহুল্য মিল বা আত্মিক যোগ থাকার অর্থ একাকার হওয়া

কদাচ নয়। সত্যকার প্রতিভা যেখানে আছে সেখানে প্রকাশ কিছু স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হবেই। আর একালের অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে এই বড় কথাটা ভোলা উচিত নয় যে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু লেখা বাদ দিলে আমাদের একালের সাহিত্য রোমাণ্টিক ভিন্ন আর কিছু হয়নি—রবীন্দ্রনাথ যতখানি রোমাণ্টিক তার চাইতে অনেক বেশি রোমাণ্টিক (গ্যেটের ভাষায় রুগ্‌ণ) এই সাহিত্য।

একালের অনেক সমালোচকের মতো গুপ্ত মহাশয়ও এবিষয়ে সচেতন যে প্রকাশের ত্রুটি নজরুলের রচনায় বেশ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও নজরুল-সাহিত্যের শাশ্বত মূল্য অল্প নয় এই তিনি ভেবেছেন, কেননা, নজরুল জনজাগরণের কবি আর সেই জনজাগরণ উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু ব্যাপারটি আরো জটিল। উৎকৃষ্ট প্রাণোদ্দীপক চিন্তার মূল্য যে সাহিত্যে কম তা নয়, কিন্তু সাহিত্যরূপে সার্থক হতে হলে সেই চিন্তার উৎকৃষ্ট রূপ পাওয়া চাই। নজরুলের উৎকৃষ্ট চিন্তা (ধরুন 'সাম্যবাদী'তে তাঁর যে সব চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে সে সব) কি উৎকৃষ্ট রূপ পেয়েছে? পায়নি এই কথাই বলতে হবে, কেননা, আবেগ এসব কবিতার মধ্যে অনেকখানি তরল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব কথা ভেবেই এক সময় আমি বলেছিলাম, নজরুল কবি যত বড় তার চাইতে অনেক বেশি তিনি যুগ-মানব। কিন্তু পরে আমার সেই মত বদ্‌লে' আমি স্বীকার করি যে কবিরূপেও নজরুল বড়—অবশ্য তাঁর সার্থক কবিতার বা রচনার পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু যত কমই হোক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর বাণী যখন কখনো কখনো লাভ করেছে তখন তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদাই দিতে হবে।

গুপ্ত মহাশয় নজরুলের গানকে মনে করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আমরাও তাঁর গানের উচ্চ মূল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তবে তাঁর তেমন গানের সংখ্যা কম। আর তাঁর কিছু কবিতাও যে উচ্চ মর্যাদার সে কথা আমরা বলেছি।

কিন্তু নজরুলের গানগুলো তো হারিয়ে যাবার পথে দাঁড়িয়েছে। সেগুলো খুব কম গাওয়া হয়—তার ফলে গানগুলোর সুর যে অল্পদিনেই হারিয়ে যাবে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট। নজরুলের এই মূল্যবান সৃষ্টির সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ত্যাগ করবার দিন আমাদের শিক্ষিত সমাজের এসেছে।

গুপ্ত মহাশয়কে তাঁর এই বইখানির জন্য পুনরায় সাধুবাদ জানাই। আশা করি অচিরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং তখন এর সমৃদ্ধতর রূপ আমরা দেখতে পাব।*

কাজী আব্দুল ওদুদ

* নজরুল চরিতমানস—ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০, টাকা।

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস। শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [প্রথম খণ্ড]—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ। কলিকাতা-১। মূল্য বারো টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ—শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ-ভবন। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রসঙ্গে এবং তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার গুরুত্বের কথা ভোলবার নয়। সজনীকান্তের নিজের কথাতেই এই বিষয়টির প্রধান দিকটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের আরিস্টটল বিজ্ঞানধর্মী আধুনিক কালে, যুক্তির সাহায্যে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তির প্রয়াসের মধ্যে। কোনও সংকটকালের পথনির্দেশক অর্থাৎ ধর্ম-প্রবর্তকরূপেও তিনি আসেননি। তিনি এসেছিলেন কবি হিসেবে, সাহিত্যশিল্পী হিসেবে, সংগীতস্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু এই কবি-কর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করেছিলেন যে, এই সংশয়শাসিত যুগেই তিনি অনন্যরূপ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছেন; ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শিক্ষা, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সমস্ত কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর সংস্পর্শে।...তিনি শুধু যুগপ্রবর্তক মাত্র রইলেন না, সমস্ত যুগটাই তাঁতে বিধৃত হয়ে রইল।'

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী সামনের পঁচিশে বৈশাখে। এ সময়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা বই বেরুবে। শ্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যের নানা আধুনিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাঁর এ বইখানি সেই মহোৎসবের মরশুমী অর্ঘ্য তো বটেই,—তা ছাড়া আরো কিছু। সজনীকান্ত তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন 'আমরা মনে মনে তাঁহার বাণী-মূর্তি ধ্যান করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে সকলের বড় খবর।' এবং তিনি আরো বলেছেন,—রবীন্দ্রনাথ যেহেতু গ্রামোফোন ফোটোগ্রাফি রেডিও সিনেমার যুগে বাস করে গেছেন,—আধুনিক যুগের এইসব সুযোগ-দুর্যোগের ফলে তাঁর বাণীমূর্তি ব্যতীত তাঁর সম্বন্ধে লৌকিক অন্যান্য নানান তথ্য টুকরো টুকরোভাবে পুঞ্জিত হয়ে আছে। লেখক এই দুদিকেই দৃষ্টি রেখে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এ-বইয়ে সেগুলি এক-সঙ্গে ছেপে দিয়েছেন। 'রবীন্দ্র জীবনীর নূতন উপকরণ' অধ্যায়টি এবং বইয়ের শেষ অধ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' রবীন্দ্র-চর্চার সুবিপুল আয়োজনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ', 'শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ', 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির তুলনায় 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ', 'রবির পূর্ণ উদয়' এবং 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি'—এই তিনটি লেখা তথ্যের দিক থেকে বেশি সমৃদ্ধ। 'রবি-রশ্মি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিচিত্র কথার অতি সুন্দর সংকলন। তাছাড়া 'রবির পূর্ণ উদয়' নিবন্ধটিতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর *Sophia* পত্রিকায় প্রকাশিত রহস্যব্যঞ্জক

উপাধ্যায়ের 'The World Poet of Bengal' প্রবন্ধটি এবং ১৩০৭ সালে ৩০এ চৈত্র তারিখে লেখা চন্দ্রনাথ বসুর একখানি চিঠি দেখা গেল। এ তথ্যগুলি পরিচিত তথ্য বটে, তবু এখানে এ-সবের উল্লেখ খুবই সংগত এবং বিশেষ স্মরণীয়।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুমুখী প্রকাশ' নামে লেখাটি সত্যিকার সৎ পাঠকের রচনা। সজনীকান্ত তাঁর স্বভাববশেই একাধারে অভিনিবেশশীল পাঠক এবং অপ্রিয়ভাষী সমালোচক বলে পরিচিত। তাঁর এই বইখানিতে তিনি কিন্তু তাঁর স্বভাবের এই দ্বিতীয় 'ভাব'টি সম্পূর্ণ উহ্য বা স্থগিত রেখেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামে এ বই উৎসর্গ করা হয়েছে। আড়াইশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বইখানি সব দিক দিয়ে চমৎকার। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বহির বিস্তার এবং বিপুল গভীরতা একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, সেটা দেখতে হলে খুঁটিয়ে সর্বাঙ্গও দেখতে হয়, আবার পূর্ণ রবীন্দ্র-সত্তাকেও দেখতে হয়। একই প্রয়াসে এই দুকাজ সাধিত করা সহজ নয়। সজনীবাবু তা করেননি। তবে, তাঁর ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে এই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদকে সম্যক মর্যাদা দিতে আজও শেখেনি! তাঁর এই বইখানি সেদিকে বাঙালী পাঠককে একটু নাড়া দেবে। 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' অধ্যায়ে ১২৯২ সালের চৈত্রের 'বালক' (১৮৮৬ মার্চ) পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অবসাদ' কবিতাটি এ-বইয়ে পুরোপুরি ছেপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা সম্বন্ধে উৎসাহী গবেষকের তিনি খুবই সাহায্য করেছেন। তবে, ঐ কবিতার তারিখ হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই দিনটি কেন যে অগ্রাহ্য হবে, সে-বিষয়ে তাঁর যুক্তি উপযুক্ত রকম অকাট্য বলে মনে হোলো না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাতেই লিখেছিলেন :

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের এই অঙ্গীকারের এবং তাঁর জীবনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিপুলতার স্বাদ আছে সজনীকান্তের এই বইখানিতে।

রামগতি ন্যায়রত্ন বা হারানচন্দ্র রক্ষিত যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছিলেন, তখন থেকে আজকের আমল পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার সংখ্যা কিছু কম নয়। আজকাল ইস্কুল-কলেজে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেহেতু পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেজন্যে এ বিষয়ে নানা বই যে লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরো অনেক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে অজস্র বইয়ের মধ্যে এ-বিষয়ে স্মরণীয়তম লেখা বোধ হয়, আদিতে দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—এবং তারপরে, একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"। দীনেশচন্দ্রের বইখানির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুকুমারবাবুর বইয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনলিপি ছাপা হয়েছে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকখানি ছোটো-বড়ো বই বেরিয়েছে। তারপর ১৯৫৯-এ অধ্যাপক অসিতকুমারের 'বাংলা সাহিত্যের ইতি-বৃত্ত' গ্রন্থমালার এই প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছে।

বৃহদায়তন এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গল বা বিশেষ

বিশেষ প্রসঙ্গের দিকে নজর রেখে কেউ কেউ এ-দিকে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইও লিখেছেন—যেমন, ইংরেজিতে লেখা প্রিয়রঞ্জন সেনের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা, অথবা, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গঠন পর্বের ওপর বিশেষ নজর রেখে লেখা সজনীকান্ত দাসের বাংলা বইখানি। কয়েকজন অধ্যাপক ইংরেজিতেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন। সুকুমারবাবুর লেখা অনেকগুলি বইয়ের কথা মনে পড়ে।

অসিতকুমার তাঁর এই বইখানির নিবেদনে বলেছেন—'এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসূরিগণ যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।' তাঁর বইয়ের এই প্রথম খণ্ডে খ্রীষ্টাব্দের দশম শতক থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক অবধি—অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছরের বাংলা সাহিত্য-প্রবাহ—এবং সেই সঙ্গে, এই সময়-সীমানার মধ্যে বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-পরিবেশের প্রাসঙ্গিক ঘটনাধারা,—আর, তৃতীয়তঃ প্রত্যেক পর্বের বাংলা সাহিত্য-সংবাদের পাশাপাশি য়ুরোপীয় সাহিত্যের তৎকালীন পরিচিতি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে এক-একটি পর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনা গ্রন্থভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আজকাল তুলনাভিত্তিক সাহিত্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনার রেওয়াজ হয়েছে। সেদিক থেকে এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই লেখকের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। অবিশ্যি এরকম তুলনার চেষ্টা সকলের পক্ষে সব ক্ষেত্রে সংগত হয় না। তবে এই বইখানিতে মাত্র দুটি পর্বের সীমা ধরে নিয়ে—প্রথম পর্বে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় পর্বে ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে পঞ্চদশের শেষ—১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—মোট এই দুটি সময়-বিভাগের মধ্যেই তুলনার কাজটুকু করা হয়েছে। অন্যান্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁর মতামত অন্যান্য সাহিত্য-ঐতিহাসিকের বই থেকে নেওয়া। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক খবরাখবর প্রধানতঃ 'পূর্বসূরিগণের' গবেষণালব্ধ। অসিতকুমার নিজে পরিশ্রম করে তথ্যগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। এবং এই বিন্যাসভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব।

বাংলায় দীনেশচন্দ্র এবং সুকুমার সেন এই দুই প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ইতিহাসপ্রণেতাই দীর্ঘকালের অধ্যয়ন, সংগ্রহ এবং ভূয়োদর্শিতার অধিকারে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক, সমালোচক, গবেষক সকলেরই সমাদর লাভ করেছেন। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যোগ্য অনুসরণকারী,—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র ছাত্রপাঠ্য বই হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ বইখানি সে জাতের নয়। অধ্যাপকের তথ্য-সতর্কতার সঙ্গে সৎ-পাঠকের আস্বাদন-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া গেল এর নানান অংশে। দেহোল্লাস বর্ণনায় ভর্তৃহরি বা অমরুকবির সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্যের আলোচনায় (পৃঃ ৪১৬-৪১৭), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যপরিচয় অংশে (পৃঃ ৩৩০-৩৪৭), কৃত্তিবাসের কবিত্ব প্রসঙ্গে (পৃঃ ৫৫০-৫৬০) এবং আরো কয়েকটি জায়গায় তাঁর সতর্কতা খুবই প্রশংসনীয়। তবে 'চর্যায় কাব্যরস' কথাটাই কেমন যেন হাস্যরসের ইশারা! কোনো রকম উগ্র পক্ষপাতিত্ব না করেও, চর্যাপদে যে কবিত্ব খুবই বিরল, সে-কথা বলতে আপত্তি কিসের?

কিন্তু এ-রকম দুয়েকটি ব্যাপার এ-আলোচনা সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক মন্তব্য মাত্র। অসিতকুমার খুবই বড়ো কাজে হাত দিয়েছেন। প্রশংসাই তাঁর প্রাপ্য। পরের খণ্ডগুলির জন্যে প্রতীক্ষা জেগে থাকবে পাঠকদের মনে মনে।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একখানি চিঠি থেকেই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। সতেরোর শতকে একাধিক আহোম-রাজের লেখা আরো কয়েকখানি চিঠি পাওয়া যায়। কিছু কিছু দলিলপত্রও রয়েছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন যে সতেরোর শতকের অনেক আগেই 'বাংলা সাধু-ভাষার সার্বভৌমিক রূপ ভূমিষ্ঠ' হয়েছিল! ঐ শতকেরই শেষদিকে—১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি বাংলা চুক্তিপত্রের নমুনা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তার প্রতিলিপিও ছাপা হয়ে গেছে। আঠারোর শতকের দলিল-পত্রের মধ্যে কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্রখানি মূল্যবান। "কোচবিহারের ইতিহাস" [প্রথম খণ্ড] যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা সে-দলিলও দেখেছেন। সতেরো-আঠারো শতকে বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ গদ্যে-পদ্যে সাধনা-সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর লিখে গেছেন। সেগুলি 'কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নকল-করা এই রকম এক রচনাতেই যথার্থ সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম নমুনা পাওয়া যায় বলে সুকুমারবাবুর বিশ্বাস। সতেরোর শেষে, আঠারোর শতকের প্রথমে—নেপালে লেখা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রসঙ্গে এক নাট্যরচনার মধ্যে সাধু বাংলা গদ্যের নমুনা বিদ্যমান। এ-ছাড়া সে-সময়ের অন্যান্য কিছু কিছু লেখাতেও—যেমন, ভাষাপরিচ্ছেদের খণ্ডিত অনুবাদে, কোনো কোনো বৈদ্যক পুঁথিতে, বিক্রমাদিত্য-বেতাল কাহিনীতে বাংলা গদ্যের উদাহরণ আছে। সতেরোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভূষণার এক জমিদার-পুত্রকে মগ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। এক পোর্তুগীজ পাদ্রি তাকে উদ্ধার করে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তার নাম রাখেন দোম্ আন্তোনিও। এই দোম্ আন্তোনিও নিজেও পাদ্রী হয়েছিলেন। "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" নামে তিনি যে প্রশ্নোত্তর-পর্যায়ের বই লিখেছিলেন, আঠারোর শতকের প্রথম দিকেই পাদ্রী মানোএল-দা আসসুম্পসাম্ পোর্তুগীজ ভাষায় তার অনুবাদ করেন। দোম্ আন্তোনিওর ভাষা আঞ্চলিক নয়, সেটা ছিল 'সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা'। অবিশ্যি তাতে পূর্ববাংলার কথ্য ভাষার ছাপ থেকে গেছে। সেই অনুবাদক মানোএলই ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে বাস করবার সময়ে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ" লিখেছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন শহরে রোমান হরপে সে বই ছাপা হয়েছিল। সেই আরবী-ফারসী শব্দ-কণ্টকিত, ব্যাকরণের নানা ত্রুটিময়, ভাওয়ালের উপভাষা-খচিত বইখানিই আমাদের প্রথম ছাপা বাংলা বই!

তারপর, উনিশ শতকের আদিপর্বে ইংরেজ-আমলেই প্রথম বাংলা গদ্য-চর্চা শুরু হয়। তার আগেই ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানিরই অন্যতম কর্মচারী ন্যাথেনিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড একখানি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি থেকে সে-বই ছাপা হয় এবং তাতেই প্রথম বাংলা হরপ ব্যবহৃত হয়। সেই হ্যালহেড-উইলকিন্স-জোন্সের আমল থেকে শুরু করে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আর শ্রীরামপুর খ্রীষ্টীয় মিশনের কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এবং তাঁদের অনুকূল-প্রতিকূল বাঙালী গদ্য-লেখকদের উদ্যমের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ বাংলা গদ্য নেমে এসেছে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরে,—অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনার পাশাপাশি বয়ে গেছে প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য-ধারা,—বঙ্কিমচন্দ্র নানা রকম গদ্য লিখেছেন,—বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথ,—রবীন্দ্রনাথের সমকালে অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং নবীনতর অন্যান্যেরা!

অধ্যাপক সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" বইখানি এই সুদীর্ঘ তথ্যবহুল ধারা সম্বন্ধে আকর-গ্রন্থ। তিনিই শ্যামলকুমারের এ-আলোচনার 'পরিচিতি' লিখে দিয়েছেন। বাংলা গদ্যের গঠন-বিশ্লেষণের এবং গদ্য-বাহিত সাহিত্যের সঙ্গে গদ্য-বাহনের যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কাজের সূচনা ঘটেছিল দীনেশচন্দ্রের বাংলা গদ্য-শৈলী সম্পর্কিত ইংরেজি বইখানিতে। অধ্যাপক শ্যামলকুমার সেই ধারার নবীনতম আলোচক। তিনি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আয়োজনের মধ্যে বাংলা গদ্যের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস সাজাবার চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ মিত্র

রমেশ রচনাবলী—যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মূল্য নয় টাকা।
রমেশচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধ সংকলন—নিখিল সেন সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। মূল্য পাঁচ টাকা।
বঙ্গ সাহিত্য সম্ভার—প্রতিভাকান্ত মৈত্র সম্পাদিত। দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ছয় টাকা।

পিছনের দিকে ফিরে তাকানো যে কোন কোন ক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্য-পাঠক তাই গমমান সাহিত্যের সঙ্গেই দূর-পুরাতন বা নিকট-পুরাতন সাহিত্যেও সমান উৎসাহী। এবং তাঁর-ই অনির্বাণ উৎসাহের ফলে বিস্মৃতি সাহিত্যের মূল্যবান কর্মকৃতিকে কখনো সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলতে পারে না।

এই ধরনের পাঠক অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও বর্তমান। প্রমাণ যোগেশচন্দ্র বাগল, নিখিল সেন, প্রতিভাকান্ত মৈত্র। তাঁরা সম্প্রতি বিগত দিনের বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার-কর্মে যে সনিষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহেই প্রশংসাযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ইতিমধ্যেই গবেষক ও সাহিত্যসন্ধিৎসুমহলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর রচনাবলী স্বয়ম্মূল্যে প্রতিষ্ঠিত। সম্পাদনা-কর্মেও তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদী। ইতিপূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাময়িক রচনাবলীর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠকসমাজকে, সম্প্রতি রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসসংগ্রহ—বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, এবং সমাজ—সম্পাদনা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তাঁর প্রথম চারটি উপন্যাসও জনপ্রিয়, অন্তত এক সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসেও যে তিনি উল্লেখ্যরকমের মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ সংসার, সমাজ এবং "সংসার"-এর পরিবর্তিত রূপ সংসার-কথা। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"-য় রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত বাগল তাঁর ভূমিকায় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র সম্পর্কে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেই আলোচনাটি, বলতে গেলে, প্রায় পূর্ণতঃই উদ্ধৃত করেছেন। এর ফলে "রমেশ-রচনাবলী"-র পাঠক উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে, তবে ভূমিকাকারের কাছে পাঠকের রমেশ-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণী আলোচনার প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। রমেশ সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীবাগলের যে দু-একটি প্রাসঙ্গিক পংক্তি আছে তা মূলতঃ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বা উক্তির-ই প্রতিধ্বনি। তবে তাঁর ভূমিকা যে রমেশচন্দ্রের জীবন-কথা ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কীয় তথ্যসম্ভারে ঐশ্বর্যবান তা অবশ্যস্বীকার্য।

রমেশচন্দ্র শুধুমাত্র উপন্যাসরচনার মধ্যেই যে তাঁর সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ রাখেননি, এ তথ্য শিক্ষিত ও গবেষকসমাজের অজ্ঞাত না হলেও বৃহত্তর পাঠক-সমাজের বোধ করি তেমন ঘনিষ্ঠভাবে এতদিন জানা ছিল না। এতদিন, কিন্তু এখন নয়, কারণ সম্প্রতি নিখিল সেন পুরোনো সাময়িক পত্রিকার ফাইল থেকে মনস্বী রমেশচন্দ্রের মূল্যবান বাংলা প্রবন্ধগুলি উদ্ধার করে সমালোচ্য "রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সংকলন" নামে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য-ইতিহাস ও অর্থনীতি-বিষয়ক মোট চোদ্দটি প্রবন্ধের সমবায়ে প্রকাশিত এই সংকলন-গ্রন্থে যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণীক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা এ কালীন বাংলা সাহিত্যেও দুর্লভ। সাহিত্যে কেন, সামগ্রিকভাবেই বলা যায়, রমেশচন্দ্রের মতো মননশীল ব্যক্তির ও বহুমুখী প্রতিভা বর্তমানে বিরলদৃষ্ট। রমেশচন্দ্রের চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার উদাহরণ 'উন্নতির যুগ', যথার্থ ইতিহাসবোধের প্রতিফলন হিসাবেও যা অভিনন্দনযোগ্য। 'সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংস বা পলাশীর যুদ্ধের কথাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না' (পৃ. ৫২) বা 'অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তুলনা করিয়া পাঠ করিলে আমরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে পারি, এবং ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি স্থির করিতে পারি' (পৃ. ৪০) ইত্যাকার মন্তব্যগুলি আজ থেকে ৬৮।৬৯ বছর আগে এমন একজনের লেখা যিনি পেশাগতভাবে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন না অথচ এখনও পর্যন্ত এমন কি কোন সুপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থের নাম করতে পারি যা রমেশচন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য দুটিকে সার্থক করে তুলতে পেরেছে? কিংবা তাঁর কীর্তিস্তম্ভ-প্রতিম "দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া"-র মতো ক'খানা বই বেরিয়েছে? ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশেষত আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার দিকে ক'জন পণ্ডিত মনঃসংযোগ করেছেন? বর্তমান সংকলনে 'বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি', 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্রের বাংলা রচনাবলীর কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন। তেমনি উল্লেখ করা যায়, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' বা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মতো সাহিত্য-প্রবন্ধের, যেখানে পাঠক একজন যথার্থ সাহিত্যরসজ্ঞ ও সাহিত্যকারের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিংবা উল্লেখ করা যায় 'ঋগ্বেদের দেবগণ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ যেখানে সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র পুরাতাত্ত্বিক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। এই সংকলনে গ্রথিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে যে সাধারণ মন্তব্য করা যায় তা শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ভূমিকাতে বলেছেন : 'সকল সময়েই রমেশচন্দ্রের রচনার মধ্যে দুটী লক্ষণ খুবই পরিস্ফুট। প্রথমটি হল তাঁর মোহমুক্ত বিচারশীল মন। দ্বিতীয়টি হল, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীসিংহের ভূমিকাটি সুলিখিত। 'নিবেদন' অংশে সম্পাদক নিখিল সেন রমেশচন্দ্রের সাহিত্যজীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা তথ্যনিষ্ঠ ও সুখপাঠ্য। 'আপন কথা' অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রের জীবন ও রমেশ রচনাবলীর একটি তালিকা

সন্নিবেশিত হওয়াতে বইটির মূল্য বেড়েছে। এক কথায়, রমেশচন্দ্রের মতো একজন মননশীল প্রবন্ধকারকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য নিখিল সেন সাহিত্যসন্ধিৎসু বাঙালি পাঠকদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

নিখিল সেনের মতো আরও একজন বাঙালি পাঠকের ধন্যবাদভাজন। তিনি অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা "বঙ্গসাহিত্য সম্ভার" (প্রথম খণ্ড)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'রাজাবলি', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতা, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'—এই সমস্ত গদ্য-ও-পদ্যকর্মের গ্রন্থনায় "বঙ্গসাহিত্য সম্ভার"-এর আত্মপ্রকাশ। যদিও এই সমস্ত রচনার অধিকাংশেই সাহিত্যিক মূল্য বলতে গেলে বিশেষ কিছুই নেই, তবু সাহিত্যের ঐতিহাসিক, শিক্ষিত সাহিত্যপাঠক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এদের মূল্য কম নয়। যেমন বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্বের নমুনা হিসাবে 'রাজাবলি'র বা 'নববাবু-বিলাস'-এর গদ্যের উল্লেখ করা যায় এবং এই নমুনা সাহিত্যগবেষক শুধু নয়, সাধারণ সাহিত্যরসিকের কাছেও আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে। কিংবা উনিশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান লাভেচ্ছু ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীকে পাঠ করতে হবে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বিধবা-বিবাহ', 'ছদ্ম মিশনারী' বা 'কৌলীন্য' প্রভৃতি সমাজবিষয়ক কবিতা। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সব লেখার প্রধান মূল্য সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক, পুনরুক্তির সুরে বলি, সাহিত্যিক মূল্য এদের খুবই কম, নেই বললেই চলে। এবং লেখক হিসাবে ভবানীচরণ ও ঈশ্বর গুপ্ত একই শ্রেণীর, মনোভঙ্গীতে উভয়ের সাধর্ম্য লক্ষণীয়রকমের। শ্রীযুক্ত মৈত্র ভবানীচরণ সম্পর্কে বলেছেন : 'রুচি, আদর্শ, যুক্তির নিয়ম বারে বারে লঙ্ঘিত হয় বিশেষ ক'রে রক্ষণশীলদের দ্বারা : অপরিচিত প্রথাকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব যেহেতু তাঁদের থাকে না, সেই হেতু লঘুব্যঙ্গের অস্ত্রক্ষেপ তাঁদের সহজ আয়ত্তে থাকে। ভবানীচরণ এই ব্যঙ্গরসের শিল্পী' (পৃ. ॥৶) এবং ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'সমাজ-সংস্কারের বা ধর্মমতের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল, ভবানীচরণেরই উত্তর সাধক।' শ্রীমৈত্রের এই উক্তি দু'টি যথার্থভাবে সত্য। কিন্তু তিনি যে-ভাবে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 'জীবনে জাগ্রত আধুনিকতার নানা লক্ষণ' দেখেছেন, আমি সে-ভাবে গুপ্ত কবিকে বিচার করতে অপারগ। ঈশ্বর গুপ্ত মৌলত প্রাচীনলগ্ন, নবীনের বিরোধী, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক-স্পর্শ-বঞ্চিত। রেনেশাঁসের সার্থক প্রতিভূ বঙ্কিম-মধুসূদনের জগত থেকে তিনি বহু দূরে অবস্থান করতেন। গুপ্ত কবি সম্পর্কে এই স্বয়ংপ্রভ মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায়, তাঁর মধ্যে আবিষ্কৃত আধুনিকতার লক্ষণগুলি তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। মৈত্র মহাশয়ের আর-একটি উক্তি (ভবানীচরণ আদির রচনায়) 'ব্যঙ্গরস উনিশ শতকে বাঙালীর নবজাগরণ-যুগে সাহিত্যের প্রায় প্রধান রসরূপে কাজ করেছে' গ্রহণ করতে বাধে। নবজাগরণ-যুগের দুই স্তম্ভপ্রতিম সাহিত্যিক বঙ্কিম বা মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের সাধারণ মন্তব্য কতখানি প্রযোজ্য? বঙ্কিমী ব্যঙ্গরসের নিদর্শন "কমলাকান্তের দপ্তর"কে কোনভাবেই তৎকালীন কোন ব্যঙ্গরচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয়-রকমের অনন্য সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। মধুসূদনের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" বা "একেই কি বলে সভ্যতা"র ব্যঙ্গরসও ভবানীচরণ-আদির ব্যঙ্গরচনা থেকে গুণগতভাবে পৃথক, যদিও

মধুসূদনের সৃষ্টি হিসাবে এরা কিছুটা বিবর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা মধুসূদনের কাব্যকর্ম—নবজাগরণের যুগের প্রতিনিধি-সৃষ্টি—এদের মধ্যে 'ব্যঙ্গরস কি প্রধান রসরূপে কাজ করেছে' বলা যায়?

শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্রের ভূমিকাটি সুলিখিত বলেই তাঁর দু-একটি অভিমত নিয়ে এত কথা বললাম। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে বিচার করার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে, উনিশ শতকের বাঙালী মানসতাকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁর ভূমিকায় পরিকীর্ণ।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

শেষ গ্রীষ্ম— বরিস পাস্তারনেক। অনুবাদ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবি হিসেবে বরিস পাস্তারনেক আমাদের দেশে অনাবিষ্কৃত ছিলেন না, তাঁর দু'একটি কবিতার বাংলা অনুবাদও চোখে পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগ্রন্থ "ডাক্তার জিভাগো" সম্মান ও অসম্মানের সাদাকালো রেখায় তাঁকে সহসা যেমন বিচিত্র এবং দ্রষ্টব্য করে তুলেছে, তা আমাদের তো বটেই পাস্তারনেকেরও অকল্পনীয় ছিল। "ডাক্তার জিভাগো"-কে এ যুগের মহত্তম উপন্যাস বলা হ'য়েছে। উপন্যাস তখনই মহত্তম হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, যখন তা কোনো সমাজের এক বিশেষ কালের যন্ত্রণা ও আশাআকাঙ্ক্ষার আলেখ্য চরিত্রসৃষ্টির মারফৎ জীবন্ত করে তোলে। এর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বালজাক ও টলস্টয়। এবং এই মানদণ্ডে "ডাক্তার জিভাগো" খণ্ডিত ও একপেশে মনে হলে দোষ দেওয়া চলে না। অন্য পক্ষে, একজন দিশেহারা আত্মানুসন্ধানীর ব্যক্তিগত সংগ্রামের দলিল হিসাবে তার যে কিছুটা মূল্য আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

আসলে পাস্তারনেক ছিলেন একজন কবি, যিনি কবিতার প্রক্ষেপ হিসেবে উপন্যাস রচনা করেছেন এবং কবিতা দিয়েই তার উপসংহার টেনেছেন। তাঁর উপন্যাস তাই যতোটা আবেগসমৃদ্ধ, ততোটা তথ্যানুগ নয়। আমাদেরও সেইভাবে আলোচনায় নামলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হত। দুর্ভাগ্য এই যে, রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই এ ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্যের জগতেও অনুপ্রবেশ করেছে, এবং সমালোচকদের মাথা-গরম করে তুলেছে।

"শেষ গ্রীষ্ম" পাস্তারনেকের প্রথম উপন্যাস। এও কবির রচনা—আত্মজৈবনিক, স্বপ্ন নির্ভর। উপন্যাসের সংহতি এখানে অস্পষ্ট, বক্তব্য ভাসাভাসা, চরিত্রপাত্র মোটা দাগে আঁকা। কিন্তু এর ঐশ্বর্য হল লেখকের আত্মপ্রকাশের আকুতি এবং কাব্যময়তা। লেখক নিজেই তাঁর নায়কের লেখার জবানীতে বলেছেন—'এক বৈঠকে সমস্ত রাত জেগে জীবনে প্রথম বা দ্বিতীয়বার যে মানুষ দেখে এ তারই প্রথম খসড়া।...এই সব প্রথম সন্ধ্যা-কালীন উচ্ছ্বাসে অগঠিত, অস্পষ্ট ও জীবন্ত রেখাহীন ভাব ছাড়া আর কিছুই বিশেষ দানা বাঁধে না; আর এসব লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, অভিজ্ঞতার থেকেই স্বাভাবিক-ভাবে সে-ভাব জন্ম নেয়।' তাঁর নিজের রচনার বিষয়েই এই মন্তব্য মোটামুটি সত্য।

কিন্তু আগেই বলেছি, কাব্য আছে এই রচনায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে সেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা অনুমান করা যাবে।

...'ঘোড়া চিঁহিহি করছে, কুকুর ঘেউ ঘেউ। হঠাৎ-থামা কর্কশ আওয়াজটা সুতোয় বাঁধা ছোট এক টুকরো টিনের পাতের মত কাঁপছে হাওয়ায়।'

—২৬ পৃষ্ঠা

'রাস্তার আলো আর কুয়াশা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পাশব হাই তুলছে। চারদিকে আগুনের কণা ছিটিয়ে দিন তার কাজে নামল।' —৬২ পৃষ্ঠা

'লোকজন নেই রাস্তায় আর তার শূন্যতা যেন স্তব্ধতার চিৎকার তুলেছে।'

—৬৫ পৃষ্ঠা

'দিন এখনো পুরোপুরি জাগেনি আর মড়ার মুখের দাড়িতে রুটির গুঁড়োর মতন গুমোটের জট পপলার গাছের পাতার মর্মরে ঝুলছে এখনো।' —৬৫ পৃষ্ঠা

'জানলার সার্সিগুলো যেন শীতের বন্দী স্রোত, বিশাল বাতাস যেন বলিষ্ঠ বাহু আর বার্চগুলো যেন জানলা বরাবর হেঁটে এসেছে, ঝড়কুটো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, জানলায়, জলের ফোয়ারায়, আর বাজনার শব্দ যেন ধনুকের মতন একবার ডাইনে, আরেকবার বাঁয়ে হেলছে আর দুলছে আর আমাদের কাছে আনছে আরো প্রতিধ্বনির আভাস।' —৮১ পৃষ্ঠা

অচিন্ত্যকুমার খ্যাতিমান লেখক। তাঁর নিজের ভাষা বলিষ্ঠ, অনুবাদের ভাষাও বেশ আঁটসাট, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু বেশি প্যাঁচালো বলে মনে হল। তাঁর মতো ভাষাশিল্পী কি আরেকটু সহজ করতে পারতেন না? তাছাড়া ৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি যে অনুবাদে লিখেছেন, 'সুম্যান ও চোপিন বাজাচ্ছে' তার শেষোক্ত নাম কি 'শোপ্যাঁ' নয়? বিদেশী নামের উচ্চারণ-বিভ্রাট সকলেরই নিয়তি, কিন্তু এ নাম তো ভিড়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়!

মণীন্দ্র রায়

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য—শ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস গবেষক ও যশঃপ্রার্থী লেখকদের প্রিয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই বিষয়ের উপর অনেকগুলি বই বেরিয়েছে; তাছাড়া সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় নবজাগরণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রায়ই চোখে পড়ে। রচনার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাবটা সুস্পষ্ট। একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি এবং নতুন ব্যাখ্যার অভাব সাধারণ পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের উপর লেখা নতুন কোনো বই হাতে এলে প্রথমেই আশঙ্কা হয় এখানেও পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। সাধারণ পাঠকের কথা না হয় বাদ দিলাম। অধ্যাপক সুকুমার সেনও আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে 'বিন্দুমাত্র নতুন কথা বলবার নেই।'

নতুন কথা না থাকতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিকোণ অভিনব হলে পুরনো কথাও নতুন হয়। সাহিত্যে নতুন মূল্য বড় নয়; নতুন করে বলাটাই অভিনন্দিত হয়। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচিত হলে পুরনো তথ্যও মন আকৃষ্ট করতে পারে। নবজাগরণের একটি

সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রস্তাবও ভবিষ্যৎ গবেষকরা ভেবে দেখতে পারেন। সামগ্রিক ইতিহাস এখন পর্যন্ত একটিও রচিত হয়নি। শিল্প-কলা ও আর্থনীতিক অবস্থার কথা অধিকাংশ বই থেকেই বাদ পড়েছে।

অধ্যাপক শ্বিজেন্দ্রলাল নাথের গ্রন্থের নামকরণ থেকে মনে হতে পারে যে তিনি সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বাংলার নবজাগরণ এ বইয়েরও বিষয়-বস্তু। রামমোহন বাংলা দেশের চিন্তাক্ষেত্রে যে ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন তার আলোচনা দিয়ে বই আরম্ভ হয়েছে। অধ্যাপক নাথ বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করেছেন। কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন ও বিহারীলালের দান, নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের নতুন ধারার প্রবর্তন; উপন্যাসে প্যারী-চাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনব সৃষ্টি; গদ্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির দান লেখকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুস্তকের 'কথারম্ভ' অধ্যায়ে লেখক নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পুস্তক রচনা করেছেন এই ভূমিকা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক নাথ অনেক বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলার গৌরবময় যুগের সাহিত্যকৃতির সমীক্ষা পাঠকদের নিকট উপস্থিত করেছেন। সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের নিকট বইটি—নবজাগরণের ভূমিকা হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করি। লেখকের পরিবেশিত তথ্য ও মন্তব্য সর্বত্র প্রশ্নাতীত নয়। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রয়োজনীয় তারিখের পঞ্জীটি সাম্যিবেশিত করায় গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপকণ্ঠে—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। মূল্য নয় টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। প্রথম পক্ষ উপন্যাসে সূক্ষ্ম কারুকর্ম, আঙ্গিকের নূতনতর ব্যবহারে বিশ্বাসী। সম্ভবত তাঁদের মতে উপন্যাস প্রদীপের আলোর সংগে তুলনীয়। একটি বিশেষ স্থান এবং বিশেষ কালকে সেই আলোর বৃত্তে সুন্দর করে পরিস্ফুট করাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা যেন সমাজের বিরাট এক তৈল-চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে। এক একটি অংশে তাঁরা আলো তুলে ধরেন। এই আলোক সম্পাত কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও ম্লান। এবং তা থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি, চিত্রের কোন্ অংশ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এইদিক থেকে তাঁরা অপূর্ব মানসিক সংযমের

পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বুঝি মনে করেন যে, যদি কয়েকটি পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে মনের ভাষাকে আঁকা যায়; বিরাট এক প্রেক্ষিতের আভাস দেওয়া যায়, তবে আর প্রয়োজন কি অনেক রঙ, অনেক তেলের ব্যবহার করে! বস্তুত এই গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ পাঠকের বুদ্ধি ও সহানুভূতির ওপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল।

অন্যদিকে অত্যন্ত পরিমিত পটভূমির বিশদ চিত্র রচনায় অন্যপক্ষ সচেষ্ট। সামান্য অথবা অসামান্য, সকল ঘটনায় তাঁদের সমান আকর্ষণ। তাঁরা একটির পর একটি চিত্র গ্রহণ করেন। নির্বাচিত ঘটনার চিত্র রচনা করেন না। ফলে উপন্যাসে যে-কারুকর্ম একটি প্রধান উপাদান, এমন বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর সেই সঙ্গে মনে হয়, তাঁদের বুঝি কোনো বিশেষ বক্তব্য নেই। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়।

"উপকণ্ঠে" কলিকাতার নিকটবর্তী একটি গ্রামের অনেকগুলি চরিত্র নিয়ে রচিত। এই গ্রামে দরিদ্র আছে, আছে মানুষের আচার ব্যবহারে শালীনতা অথবা শোভনতার অভাব। আর সেই সঙ্গে এই চরিত্রগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সর্বান্তিক হীন স্বার্থপরতা। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে শুধুই মনে হয়েছে, মানুষ একটি বিশেষ জীব, যে স্বার্থের বাহিরে অন্য কোথাও বিচরণ করে না। গজেনবাবুর এই প্রত্যয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় অসাধ্য। কারণ তিনি এমন সময়ের ঘটনা নির্বাচন করেছেন যেখানে পৌঁছুবার পথ অনধিগম্য। আমাদের অভিজ্ঞতায় সে-কাল অন্ধকার এবং বিবর্ণ। তাঁর উপন্যাসের কাল 'রাজার' কলকাতা আগমনের কিছু আগে থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ ও আর পরবর্তী কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র সমাবেশের প্রধান কারণ হল, মিল ও অমিলের সংঘাতে মূল চরিত্রের বিশ্লেষণ ও পরিণতি ঘটানো। চরিত্রগুলির মধ্যে সেই কারণেই বুঝি একটি যোগসূত্র রয়েছে। তারা যেন একটি মালার অনেক রঙের অনেক ফুল। তাদের সুরু প্রথম ফুল থেকে। এবং তাদের শেষও তার কাছেই এসে।

আলোচ্য উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছে, অথচ কোনো প্রধান চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না। আমি জানি না, গজেনবাবু কলিন উইলসনের মত নায়কের মৃত্যুতে বিশ্বাসী কিনা। বিশ্বাসী হলেও যে কালের কথা তিনি লিখেছেন, সে-কালে অন্তত নায়কের স্থান ছিল। (কলিন উইলসনের মতে আমাদের আধুনিক জীবনে নায়কের অস্তিত্ব সংশয়ের বিষয়)। অন্য চরিত্রগুলিও স্বাশ্রয়ী নয়। তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন নির্ণয় করা কঠিন। নরেন, হেম, শরত, উমা, নলিনী, রতন, শ্যামা, কমলা, অভয়পদ, অম্বিকাপদ—বিভিন্ন নামের এতগুলি চরিত্র। এদের সমাবেশ যে-কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তা' অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে গেছে। বিরাট কালের ব্যবধানে এই চরিত্রগুলির কোনো পরিণতি ঘটেনি। তারা যেন সংবেদন শূন্য। মনে হয়, এদের সকলের মনের কোঠায় গজেনবাবু চাবি দিয়ে রেখেছেন। যুদ্ধ, কলকাতার উপকণ্ঠে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, অনেক নতুন লোকের আগমন—কিছুই ঐ গ্রামের মানুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। কারখানার চিমনী থেকে নির্গত ধোঁয়া, ছায়া অথবা মেঘ কিছুরই ইসারা দিতে পারেনি।

গজেনবাবু আমাদের অনেককাল আগে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। প্রায় এই শতকের প্রথম দশকে। তবু, তদানীন্তন জীবন সম্পর্কে, অনেক মানুষের সমাবেশ সত্ত্বেও, কিছুই জানতে পারিনি। অথচ এমন আশাই করেছিলাম, চারশো বাহাত্তর পৃষ্ঠার এই বৃহৎ কলেবরের উপন্যাসে কোনো ধারণা, হয়ত কোনো জীবনবোধের পরিচয় পাব।

এ-কালে আধুনিক উপন্যাস লেখকগণ আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন, শিল্প কর্মে সূক্ষ্মতা অর্জনে প্রয়াসী। সময়ের ব্যবহার তাঁদের প্রচিন্তায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। স্থান যদিও সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাল অনন্ত বিস্তৃত। উপন্যাসে ঘটনার নির্বাচন সেই কারণেই প্রয়োজন। তা' না হলে সময়ের ওপর লেখকের আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। গজেন-বাবু এই সমস্ত আবশ্যিক উপদানগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন। ফলে উপন্যাসটি বিশ্লিষ্ট ও সঙ্গতিহীন মনে হয়। ঘটনা এবং চরিত্রগুলি যেন কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়নি। ফলে আমরা আর আলোর বৃত্তে পৌঁছুতে পারিনি।

এখন পুরনো পাত্রে আর পুরনো মদ পরিবেশন করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন এক জটিল যন্ত্রণায় বিক্ষত। তার প্রকাশভঙ্গীতে নূতন পথ নিতে বাধ্য। উপন্যাসের এই দিক পরিবর্তনের কালে গজেনবাবুর মত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছ থেকেই তো আমরা আশা করব, এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করব তিনি এই নূতন পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করবেন। আমাদের অকারণে আর পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবেন না। আর যদিও যান, আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত যেন নূতন রঙে নূতন বোধের আলোয় উদ্ভাসিত করে দেন।

নৃপেন্দ্র সান্যাল